يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ ءَامِنُوا۟ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا
مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَدْبَارِهَآ
أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ أَصْحَٰبَ ٱلسَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٤٧﴾
إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن
يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰٓ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾
أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم ۚ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّى مَن
يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٤٩﴾ ٱنظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى
ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۖ وَكَفَىٰ بِهِۦٓ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٠﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ
أُوتُوا۟ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّٰغُوتِ
وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ هَٰٓؤُلَآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ
ءَامَنُوا۟ سَبِيلًا ﴿٥١﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَمَن يَلْعَنِ
ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ نَصِيرًا ﴿٥٢﴾ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ
فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿٥٣﴾ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ
عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۖ فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ
إِبْرَٰهِيمَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَٰهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾

(৪৭) হে আসমানী গ্রন্থের অধিকারীবৃন্দ। যাকিছু আমি অবতীর্ণ করেছি তার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, যা সে গ্রন্থের সত্যায়ন করে এবং যা তোমাদের নিকট রয়েছে পূর্ব থেকে। (বিশ্বাস স্থাপন কর) এমন হওয়ার আগেই যে, আমি মুছে দেব অনেক চেহারাকে এবং অতঃপর সেগুলোকে ঘুরিয়ে দেব পশ্চাৎ দিকে কিংবা অভিসম্পাত করব তাদের প্রতি যেমন করে অভিসম্পাত করেছি আছহাবে–সাব্‌তের উপর। আর আল্লাহ্‌র নির্দেশ অবশ্যই কার্যকর হবে। (৪৮) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহ্‌র সাথে, সে যেন অপবাদ আরোপ করল। (৪৯) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা নিজেদেরকে পূত–পবিত্র বলে থাকে, অথচ পবিত্র করেন আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকেই? বস্তুতঃ তাদের উপর সূতা পরিমাণ অন্যায়ও হবে না। (৫০) লক্ষ্য কর, কেমন করে তারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, অথচ এই প্রকাশ্য পাপই যথেষ্ট। (৫১) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা কিতাবের কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়েছে, যারা মান্য করে প্রতিমা ও শয়তানকে এবং কাফেরদেরকে বলে যে, এরা মুসলমানদের তুলনায় অধিকতর সরল সঠিক পথে রয়েছে। (৫২) এরা হল সে সমস্ত লোক, যাদের উপর লা'নত করেছেন আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং। বস্তুতঃ আল্লাহ্ যার উপর লা'নত করেন, তুমি তার কোন সাহায্যকারী খুঁজে পাবে না। (৫৩) তাদের কাছে কি রাজ্যের কোন অংশ আছে? তাহলে যে এরা কাউকেও একটি তিল পরিমাণও দেবে না। (৫৪) নাকি যাকিছু আল্লাহ্ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে দান করেছেন সে বিষয়ের জন্য মানুষকে হিংসা করে। অবশ্যই আমি ইবরাহীমের বংশধরদেরকে কিতাব ও হেকমত দান করেছিলাম আর তাদেরকে দান করেছিলাম বিশাল রাজ্য।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আল্লাহ্‌র বাণী فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَدْبَارِهَآ (অর্থাৎ, তাদের ঘুরিয়ে দেব পশ্চাদ্দিকে) ঘুরিয়ে দেয়া বা উল্টে দেয়ার মধ্যে দু'টি সম্ভাবনাই থাকতে পারে। মুখমণ্ডলের আকার–অবয়ব মুছে দিয়ে গোটা চেহারাকে পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়ে দেয়াও হতে পারে, আবার মুখমণ্ডলকে গর্দানের মত সমান্তরাল করে দেয়াও হতে পারে।

অর্থাৎ, মুখমণ্ডলকে গর্দানের দিকে উল্টে না দিয়ে বরং গর্দানের মত পরিষ্কার ও সমান্তরাল করে দেয়া।— (মাযহারী, রূহুল মা'আনী)

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, এমন ধরনের বিকৃতি সাধানের ব্যাপারটি কবে সংঘটিত হবে? কারো কারো মতে এ আযাব কেয়ামতের প্রাক্কালে ইহুদীদের উপর অবতীর্ণ হবে। আবার কারো কারো মতে এ আযাব সংঘটিত হবার নয়। কারণ, তাদের কেউ কেউ ঈমান নিয়ে এসেছিল।

হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী (রহঃ) বলেন, আমার মতে এ প্রশ্নই আসতে পারে না। কারণ, কোরআনে এমন কোন শব্দের উল্লেখ নেই, যাতে বোঝা যায় যে, ঈমান যদি না আন তবে অবশ্যই এ আযাব আসবে, বরং সম্ভাবনার উল্লেখ রয়েছে মাত্র। অর্থাৎ, যদি তাদের অপরাধের প্রতি লক্ষ্য করা যায়, তবে মনে হয় তারা এমনি আযাবের যোগ্য। যদি আযাব দেয়া না হয়, তবে সেটা তাঁর একান্ত অনুগ্রহের ব্যাপার।

শেরকের সংজ্ঞা ও তার কয়েকটি দিক ঃ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে যেসব বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে, তেমন কোন বিশ্বাস সৃষ্ট বস্তুর ব্যাপারে পোষণ করাই হল শেরক। এরই কিছু বিশ্লেষণ নিম্নরূপঃ

জ্ঞানের ক্ষেত্রে শরীক সাব্যস্ত করা ঃ অর্থাৎ, (১) কোন বুযুর্গ বা পীরের ব্যাপারে এমন বিশ্বাস পোষণ করা যে, আমাদের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে তিনি সর্বদা অবহিত। (২) কোন জ্যোতিষ–পণ্ডিতের কাছে গায়েবের সংবাদ জিজ্ঞেস করা কিংবা (৩) কোন বুযুর্গের বাক্যে মঙ্গল দেখে তাকে অনিবার্য মনে করে নেয়া অথবা (৪) কাউকে দূর থেকে ডাকা এবং সাথে সাথে এ কথা বিশ্বাস করা যে, সে আমার ডাক শুনে নিয়েছে অথবা (৫) কারো নামে রোযা রাখা।

ক্ষমতার ক্ষেত্রে শরীক করা ঃ অর্থাৎ, কাউকে হিত কিংবা অহিত তথা ক্ষতি–বৃদ্ধি সাধনের অধিকারী মনে করা। কারো কাছে উদ্দেশ্য যাচ্ঞা করা। কারো কাছে রুযী–রোযগার বা সন্তান–সন্ততি প্রার্থনা করা।

এবাদতে শরীক সাব্যস্ত করা ঃ কাউকে সেজদা করা, কারো নামে কোন পশু মুক্ত করা, কারো নামে মানত করা, কারো কবর কিংবা বাড়ী–ঘরের তওয়াফ করা, আল্লাহ্ তাআলার কোন হুকুমের তুলনায় অপর কারো কথা কিংবা কোন প্রথাকে প্রাধান্য দেয়া, কারো সামনে রুকূ করার মত অবনত হওয়া, কারো নামে জীব কোরবানী করা, পার্থিব কাজ–কারবার কিংবা বিবর্তনকে নক্ষত্রের প্রভাব বলে বিশ্বাস করা এবং কোন কোন মাসকে অশুভ মনে করা প্রভৃতি।

আত্মপ্রশংসা করা এবং নিজেকে ত্রুটিমুক্ত মনে করা বৈধ নয় ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم – ইহুদীরা নিজেদেরকে

পূত-পবিত্র বলে বর্ণনা করত। তারই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তাআলা এ আয়াতে তাদের নিন্দা করে বলেছেন, তাদের দিকে একটু লক্ষ্য করে দেখ, যারা নিজেরাই নিজেদের পবিত্রতা বর্ণনা করে; তাদের ব্যাপারে বিস্মিত হওয়াই উচিত।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, কারো পক্ষে নিজের কিংবা অন্য কারো পবিত্রতা বর্ণনা করা জায়েয নয়। এই নিষিদ্ধতার তিনটি কারণ রয়েছে—

(১) অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মপ্রশংসার কারণ হয়ে থাকে কেবর তথা অহমিকা বা আত্মগর্ব। কাজেই মূলতঃ এই নিষিদ্ধতাও কেবরেরই জন্য হয়ে থাকে।

(২) দ্বিতীয়তঃ শেষ পরিণতি সম্পর্কে শুধুমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই অবগত যে, তা পবিত্রতা কিংবা পরহেযগারীর মধ্যেই হবে কিনা। কাজেই নিজে নিজেকে পবিত্র বলে আখ্যায়িত করা খোদাভীতির পরিপন্থী। এক রেওয়ায়েতে হযরত সালমা বিনতে যয়নব (রাঃ) বলেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) একবার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? তখন যেহেতু আমার নাম ছিল برة (বাররাহ্ অর্থাৎ, পাপমুক্ত), কাজেই আমি তাই বললাম। তাতে হুযুর (সাঃ) বললেন— لاتزكوا انفسكم الله اعلم البر منكم অর্থাৎ, তোমরা নিজেরা নিজেকে পাপ-মুক্ত বলে বর্ণনা করো না। কারণ, একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই জানেন, তোমাদের মধ্যে কে পবিত্র। অতঃপর বাররাহ্ নামটি পাল্টিয়ে তিনি যয়নব রেখে দিলেন।— (মাযহারী)

(৩) নিষিদ্ধতার তৃতীয় কারণটি হল এই যে, অধিকাংশ সময় এ ধরনের দাবী করতে গিয়ে মানুষের মনে এমন ধারণা সৃষ্টি হতে থাকে যে, সেলোক আল্লাহ্ তাআলার দরবারে এজন্য প্রিয় যে, সে যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত। অথচ কথাটি সর্বৈব মিথ্যা। কারণ, মানুষের মধ্যে অসংখ্য ত্রুটি-বিচ্যুতি বিদ্যমান থাকে।— (বয়ানুল-কোরআন)

মাসআলা ঃ যদি উল্লেখিত কারণগুলো না থাকে, তাহলে নেয়ামতের প্রকাশকল্পে নিজের গুণ বর্ণনা করার অনুমতি রয়েছে।— (বয়ানুল-কোরআন)

'জ্বিবত' ও 'তাগূত'-এর মর্ম ঃ উল্লেখিত একান্নতম আয়াতে 'জ্বিবত' ও 'তাগূত' শীর্ষক দু'টি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। শব্দ দু'টির মর্ম সম্পর্কে তফসীরকার মনীষীবৃন্দের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আবিসিনীয় ভাষায় 'জ্বিবত' বলা হয় জাদুককে। আর 'তাগূত' বলা হয় গণক বা জ্যোতিষীকে।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন যে, 'জ্বিবত' অর্থ জাদু এবং 'তাগূত' অর্থ শয়তান। হযরত মালেক ইবনে আনাস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ্ ব্যতীত যে সমস্ত জিনিসের উপাসনা করা হয়, সে সবই 'তাগূত' বলে অভিহিত হয়।

ইমাম কুরতুবী বলেন যে, মালেক ইবনে আনাস (রাঃ)-এর উক্তিটিই অধিক পছন্দনীয়। তার কারণ, কোরআন থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। এরশাদ হয়েছে ঃ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ (আল্লাহ্র এবাদত কর এবং 'তাগূত' থেকে বেঁচে থাক।) কিন্তু উল্লেখিত বিভিন্ন মতের মাঝে কোন বিরোধ নেই। কাজেই এর যে কোনটিই অর্থ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে 'জ্বিবত' প্রতিমাকেই বোঝাত, পরে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য পূজ্য বস্তুতে এর প্রয়োগ হতে আরম্ভ করে।— (রুহুল-মা'আনী)

আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, ইহুদীদের সরদার হুইয়াই ইবনে আখতাব ও কা'ব ইবনে আশরাফ ওহুদ যুদ্ধের পর নিজেদের একটি দলকে সঙ্গে নিয়ে কোরাইশদের সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশে মক্কায় এসে উপস্থিত হয়। ইহুদী সরদার কা'ব ইবনে আশরাফ আবু সুফিয়ানের কাছে এসে হুযুরে আকরাম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে তাদের সাথে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেয়। তখন মক্কাবাসীরা কা'ব ইবনে আশরাফকে বলল, তোমরা হলে একটি প্রতারক সম্প্রদায়। সত্য সত্যই যদি তোমরা তোমাদের এই প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে সত্য হয়ে থাক, তবে আমাদের এ দু'টি মূর্তির (জ্বিবত ও তাগূতের) সামনে সেজদা কর।

সুতরাং সে কোরাইশদিগকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশে তাই করল। তারপর কা'ব কোরাইশদিগকে বলল, তোমাদের মধ্য থেকে ত্রিশ জন এবং আমাদের মধ্য থেকে ত্রিশ জন লোক এগিয়ে আস, যাতে আমরা সবাই মিলে কা'বার প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে এ ওয়াদা করে নিতে পারি যে, আমরা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।

কা'বের এ প্রস্তাব কোরাইশরাও পছন্দ করল এবং সেভাবে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি ঐক্যজোট গঠন করল। অতঃপর আবু সুফিয়ান কা'বকে বলল, তোমরা হলে শিক্ষিত লোক; তোমাদের নিকট আল্লাহ্র কিতাব রয়েছে, কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ মূর্খ। সুতরাং তুমিই আমাদেরকে বল, প্রকৃতপক্ষে আমরা ন্যায়ের উপর রয়েছি, নাকি মুহাম্মদ (সাঃ) ন্যায়ের উপর রয়েছেন?

তখন কা'ব জিজ্ঞেস করল, তোমাদের দ্বীন কি? আবু সুফিয়ান উত্তরে বলল, আমরা হজ্বের জন্য নিজেদের উট জবাই করি এবং সেগুলোর দুধ খাওয়াই, মেহমানদিগকে দাওয়াত করি, নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখি এবং বায়তুল্লাহ্ (আল্লাহ্র ঘর)-এর তওয়াফ করি, ওমরা আদায় করি। পক্ষান্তরে এর বিপরীতে মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর পৈত্রিক ধর্ম পরিহার করেছেন, নিজের আত্মীয়-স্বজন থেকে পৃথক হয়ে গেছেন এবং সর্বোপরি তিনি আমাদের সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধে নিজের এক নতুন ধর্ম উপস্থাপন করেছেন। এসব কথা শোনার পর কা'ব ইবনে আশরাফ বলল, তোমরাই ন্যায়ের উপর রয়েছ। মুহাম্মদ (সাঃ) গোমরাহ হয়ে গেছেন।— (নাউযুবিল্লাহ্)

এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তাআলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করে ওদের মিথ্যা ও প্রতারণার নিন্দা করেন।— (রুহুল-মা'আনী)

রিপুর কামনা-বাসনা অনেক সময় মানুষকে দ্বীন ও ঈমান থেকে বঞ্চিত করে দেয় ঃ কা'ব ইবনে আশরাফ ছিল বিশিষ্ট ইহুদী পন্ডিত। সে আল্লাহ্তে বিশ্বাস পোষণ করত এবং তাঁরই এবাদত-বন্দেগী করত। কিন্তু তার মন-মস্তিষ্কে যখন রৈপিক কামনা-বাসনার পিশাচ চেপে বসল, তখন সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোরাইশদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে প্ররোচিত হয়। কোরাইশরা তার সাথে ঐক্যজোট করার জন্য শর্ত আরোপ করল যে, তাদেরকে আমাদের দেব-দেবীর সামনে সেজদা করতে হবে। সে তা মেনে নিল, যা আগেই বলা হয়েছে। সে নিজের ধর্মের বিরুদ্ধে কোরাইশদের শর্ত বাস্তবায়িত করলো বটে, কিন্তু স্বীয় ধর্ম-বিশ্বাসকে ঠিক রাখার জন্য তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া পছন্দ করলো না। কোরআনে-করীম অন্য

জায়গায় বাল'আম বাউরার ব্যাপারেও এমন ধরনের ঘটনা বিবৃত করেছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ

এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, শুধু কিতাব সম্পর্কিত এলেম বা জ্ঞান থাকাটাই কল্যাণ ও মঙ্গলকর হতে পারে না, যে পর্যন্ত না যথার্থভাবে তার অনুসরণ করা হবে এবং যে পর্যন্ত না হীন পার্থিব লোভ-লালসা ও কামনা-বাসনাকে পরিপূর্ণরূপে বর্জন করতে পারবে। তা না হলে মানুষ তার ধর্ম হেন প্রিয় বস্তুকেও স্বীয় রৈপিক কামনা-বাসনার কলীতে পরিণত করা থেকে বাঁচতে পারে না। ইদানীংকালেও কোন কোন লোক এমন রয়েছে, যারা জৈবিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্বীয় সত্য মতকে অতি সহজে বর্জন করে বসে এবং ধর্ম বিবর্জিত বিশ্বাস ও মতবাদকে ইসলামের ছদ্মাবরণে উপস্থিত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করে। না তাদের মনে আল্লাহ্র সাথে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির কোন পরোয়া থাকে, আর না থাকে আখেরাতের কোন রকম ভয়-ভীতি। বস্তুতঃ এ সমস্ত কিছুই সত্য সঠিক মতবাদকে বর্জন করে শয়তানের ইঙ্গিতে চলার পরিণতি।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, বাল'আম-বাউরা একজন বিশিষ্ট ইহুদী আলেম ও উচ্চস্তরের দরবেশ ছিল। কিন্তু যখন সে নিজের রৈপিক কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য মূসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে অশুভ চক্রান্ত করতে আরম্ভ করল, তখন মূসা (আঃ)-এর কোনই ক্ষতি হলো না। কিন্তু সে নিজে গোমরাহ্ হয়ে চিরতরে প্রত্যাখ্যাত হল।

আল্লাহ্র অভিসম্পাত ইহ ও পরকালীন অপমানের কারণ ঃ লা'নত বা অভিসম্পাত অর্থ হলো আল্লাহ্র রহমত ও করুণা থেকে দূরে সরে পড়া—চরম অপমান-অপদস্থতা। যার উপর আল্লাহ্র লা'নত পতিত হয় সে কখনও আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করতে পারে না। তাদের সম্পর্কে অতি কঠিন ভর্ৎসনার কথা বলা হয়েছে। কোরআনে আছে—

مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا

অর্থাৎ, "যাদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত হয়েছে, তারা যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই নিহত অথবা ধৃত হবে।" এই তো গেল তাদের পার্থিব অপমান। আখেরাতে তাদের অপমান এর চেয়েও কঠিন হবে।

আল্লাহ্র লা'নতের অধিকারী কারা ঃ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا আয়াতের দ্বারা বোঝা যায় যে, যার উপর আল্লাহ্র লা'নত বর্ষিত হয়, তার কোন সাহায্যকারী থাকে না। এখন চিন্তা করার বিষয় এই যে, আল্লাহ্র লা'নতের যোগ্য কারা?

এক হাদীসে আছে যে, রসূলে করীম (সাঃ) সুদগ্রহীতা এবং সুদ দাতা, সুদ সংক্রান্ত দলীল সম্পাদনকারী এবং সুদের লেনদেনের সাক্ষী সবার প্রতিই অভিসম্পাত করেছেন। এদের সবাই পাপের ক্ষেত্রে সমান।— (মুসলিম)

অন্য এক হাদীসে মহানবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন, "যে লোক লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের অনুরূপ অপকর্মে লিপ্ত হবে সে অভিশপ্ত হবে।" অতঃপর তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা চোরদের প্রতিও অভিসম্পাত করেন। যে ডিম কিংবা রশির মত সাধারণ বস্তুও চুরি থেকে বিরত থাকে না, তারও হস্তকর্তন করা হয়।— (মেশকাত)

আরেক হাদীসে বলা হয়েছে 'সুদগ্রহীতা ও দাতার উপর আল্লাহ্ তাআলার লা'নত এবং সে সমস্ত নারীর উপর যারা নিজের শরীর গোদায়, যে অন্যের শরীরও গুদিয়ে দেয়, তেমনিভাবে চিত্রকরের উপরও আল্লাহ্র লা'নত।'

অপর এক হাদীসে মহানবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন, "আল্লাহ্ তাআলা লা'নত করেন মদ্যপায়ীর প্রতি, মদ যে ব্যক্তি পান করায় তার প্রতি, তার বিক্রেতা ও ক্রেতার প্রতি, যে মদের জন্য নির্যাস বের করে তার প্রতি এবং যারা মদ্য বহন করে তাদের সবার প্রতি।— (মেশকাত)

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেছেন,— ছয় প্রকার লোক রয়েছে যাদের প্রতি আমি অভিসম্পাত করেছি এবং আল্লাহ্ তাআলাও লা'নত করেছেন। আর প্রত্যেক নবীই মুস্তাজাবুদ্দাওয়াত হয়ে থাকেন। সে ছয় প্রকার লোক নিম্নরূপ ঃ

(১) আল্লাহ্র কিতাবে যারা কাট্-ছাঁট করে, (২) যারা বলপূর্বক ক্ষমতা লাভ করে এবং এমনসব লোককে সম্মানে ভূষিত করে, যাদেরকে আল্লাহ্ অপদস্থ করেছেন আর এমন সব লোককে অপমানিত করে যাদেরকে আল্লাহ্ সম্মান দান করেছেন (৩) যারা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত তকদীর বা নিয়তিকে অবিশ্বাস করে। (৪) যারা আল্লাহ্ কর্তৃক হারামকৃত বস্তুসামগ্রীকে হালাল মনে করে। (৫) বিশেষতঃ আমার বংশধরগণের মধ্যে সে সমস্ত লোক যারা হারামকে হালাল করে নেয় এবং (৬) যে লোক আমার সুন্নতকে বর্জন করে।— (বায়হাকী)

মাসআলা ঃ নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি সম্পর্কে-যদি সে ফাসেকও হয়ে থাকে, যে পর্যন্ত একথা নিশ্চিতভাবে জানা না যায় যে, তার মৃত্যু কুফরী অবস্থায় হয়েছে, সে পর্যন্ত তার উপর লা'নত করা জায়েয নয়। এই মূলনীতির ভিত্তিতেই আল্লামা শামী এযীদের উপর লা'নত করতে বারণ করেছেন। তবে কুফরী অবস্থায় কোন ব্যক্তির মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত জানা থাকলে তার উপর লা'নত করা জায়েয। যেমন, আবু জাহ্ল, আবু লাহাব প্রভৃতি।—(শামী, ২য় খণ্ড, ৮৩৬ পৃঃ)

মাসআলা ঃ কারও নাম না করে এভাবে লা'নত করা জায়েয যে, জালেমদের উপর কিংবা মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্র লা'নত বর্ষিত হোক।

মাসআলা ঃ লা'নতের আভিধানিক অর্থ আল্লাহ্র রহমত হতে দূর হয়ে যাওয়া। শরীয়তের পরিভাষায় এর অর্থ কাফেরদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে, রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া। আর মুমিনদের ক্ষেত্রে হলে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভকারী (সৎকর্মশীলদের) মর্যাদা থেকে নীচে পড়ে যাওয়া। সে জন্যই কোন মুলসমানের জন্য তার নেক আমল কমে যাওয়ার দোয়া করা জায়েয নয়।— (কাহতানী থেকে শামী কতৃক উদ্ধৃত ঃ ২য় খণ্ড, ৮৩৬ পৃঃ)

ইহুদীদের হিংসা ও তার কঠোর নিন্দা ঃ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নবী করীম (সাঃ)-কে যে জ্ঞানৈশ্বর্য ও শান-শওকত দান করেছিলেন, তা দেখে ইহুদীরা হিংসার অনলে জ্বলে মরতো। আল্লাহ্ তাআলা আলোচ্য ৫৩ ও ৫৪তম আয়াতে ওদের সে হিংসা-বিদ্বেষের কঠোর নিন্দা করেছেন এবং তাদের বিদ্বেষকে একান্ত অযৌক্তিক বলে আখ্যায়িত করে তার দু'টি

فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ ؕ وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ
سَعِيْرًا ﴿٥٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ؕ كُلَّمَا
نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿٥٦﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ
لَهُمْ فِيْهَاۤ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ؗ وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا ﴿٥٧﴾ اِنَّ اللّٰهَ
يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰۤى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا
الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ
اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ
اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ
اَنْ يَّتَحَاكَمُوْۤا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْۤا اَنْ يَّكْفُرُوْا
بِهٖ ؕ وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًۢا بَعِيْدًا ﴿٦٠﴾

(৫৫) অতঃপর তাদের কেউ তাকে মান্য করেছে আবার কেউ তার কাছ থেকে দূরে সরে রয়েছে। বস্তুতঃ (তাদের জন্য) দোযখের শিখায়িত আগুনই যথেষ্ট। (৫৬) এতে সন্দেহ নেই যে, আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি যেসব লোক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে, আমি তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করব। তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখন আবার আমি তা পাল্টে দেব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা আযাব আস্বাদন করতে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, হেকমতের অধিকারী। (৫৭) আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, অবশ্যই আমি প্রবিষ্ট করাব তাদেরকে জান্নাতে, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। সেখানে তাদের জন্য থাকবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্ত্রীগণ। তাদেরকে আমি প্রবিষ্ট করব ঘন ছায়ানীড়ে। (৫৮) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদিগকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের কোন বিচার-মীমাংসা করতে আরম্ভ কর, তখন মীমাংসা কর ন্যায়ভিত্তিক। আল্লাহ্ তোমাদিগকে সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শ্রবণকারী, দর্শনকারী। (৫৯) হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর—যদি তোমরা আল্লাহ্ ও কেয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম। (৬০) আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বিরোধীয় বিষয়কে শয়তানের দিকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা ওকে মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়।

কারণ বর্ণনা করেছেন। একটি কারণ ব্যক্ত হয়েছে ৫৩তম আয়াতে এবং দ্বিতীয় কারণটি ৫৪তম আয়াতে। কিন্তু এ দু'টির মর্ম মূলতঃ একই। তা হল এই যে, আল্লাহ্ বলেছেন যে, তোমাদের এই হিংসা, ঈর্ষা ও বিদ্বেষ-এর কারণটা কি? যদি এ কারণে হয়ে থাকে যে, তোমরাই প্রকৃত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী অথচ তা তোমাদের হাতে না এসে তিনি পেয়ে গেছেন, তাহলে তোমাদের এ ধারণা যে একান্তই ভ্রান্ত তা সুস্পষ্ট। কারণ, এখন তোমরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার থেকে বঞ্চিত। কিন্তু তোমরা যদি তা থেকে কোন অংশ প্রাপ্ত হতে, তাহলে তোমরা তো জন্য কাউকে একটি কড়িও দিতে না। পক্ষান্তরে যদি তোমাদের এ বিদ্বেষ এ কারণে হয়ে থাকে যে, রাজক্ষমতা না হয় আমরা না-ই পেলাম, কিন্তু তাঁর হাতে কেন যাবে? রাষ্ট্রের সাথে তাঁর কি সম্পর্ক। তাহলে তার উত্তর হল এই যে, ইনিও নবীগণেরই বংশধর, যাঁদের নিকট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পূর্ব থেকেই ছিল। কাজেই রাষ্ট্র কোন অপাত্রে অর্পিত হয়নি। অতএব, তোমাদের ঈর্ষা একান্তভাবেই অযৌক্তিক।

ঈর্ষার সংজ্ঞা তার বিধান এবং অপকারিতাসমূহ ঃ মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাতা আল্লামা নবভী (রহঃ) হাসাদ বা ঈর্ষার সংজ্ঞা দান প্রসঙ্গে বলেছেন—

''অন্যের প্রাপ্ত নেয়ামতের অপসারণ কামনা করার নামই হলো হাসাদ বা ঈর্ষা।'' আর এটি হারাম।

মহানবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

''তোমরা পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, পরস্পরের প্রতি মুখ ফিরিয়ে রেখো না: বরং আল্লাহ্‌র বান্দা ও পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। আর কোন মুসলমানের পক্ষে অন্য মুসলমান ভাইয়ের প্রতি তিন দিনের বেশী সময় পর্যন্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখা জায়েয নয়।''—(মুসলিম, ২য় খণ্ড)

– ''তোমরা হিংসা-বিদ্বেষ থেকে বেঁচে থাক। কারণ, হিংসা মানুষের সৎকর্মসমূহকে তেমনিভাবে খেয়ে ফেলে, যেমন করে আগুন খেয়ে ফেলে কাঠকে।''—(আবু-দাউদ)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ আয়াতে তফসীর প্রসঙ্গে হযরত মু'আয (রাঃ) বলেছেন যে, তাদের শরীরের চামড়াগুলো যখন জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখন সেগুলো পাল্টিয়ে দেয়া হবে এবং এ কাজটি এত দ্রুতগতিতে সম্পাদিত হবে যে, এক মুহূর্তে শতবার চামড়া পাল্টানো যাবে। আর হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন,

— ''আগুন তাদের চামড়াকে একদিনে সত্তর হাজারবার খাবে। যখন তাদের চামড়া খেয়ে ফেলবে, অমনি সেসব লোককে বলা হবে, তোমরা পূর্বাবস্থায় ফিরে যাও। সাথে সাথে সেগুলো পূর্বের মত হয়ে যাবে।—(মাযহারী, ২য় খণ্ড)

আয়াতের শানে-নুযূলঃ আলোচ্য আয়াতগুলোর মধ্যে প্রথম আয়াতটি নাযিল হওয়ার একটি বিশেষ ঘটনা রয়েছে। তাহল এই যে, ইসলাম-পূর্বকালেও কা'বা ঘরের সেবাকে এক বিশেষ মর্যাদার কাজ মনে

করা হত। খানায়ে-কা'বার কোন বিশেষ খেদমতের জন্য যারা নির্বাচিত হত, তারা গোটা সমাজ তথা জাতির মাঝে সম্মানিত ও বিশিষ্ট বলে পরিগণিত হত। সে জন্যই বায়তুল্লাহ্‌র বিশেষ খেদমত বিভিন্ন লোকের মাঝে ভাগ করে দেয়া হত। জাহেলিয়াত আমল থেকেই হজ্বের মওসুমে হাজীদিগকে 'যমযম' কূপের পানি পান করানোর সেবা মহানবী (সাঃ)-এর পিতৃব্য হযরত আব্বাসের (রাঃ) উপর ন্যস্ত ছিল। একে বলা হত 'সেকায়া।' এমনি করে অন্যান্য আরো কিছু কিছু সেবার দায়িত্ব হুযুর (সাঃ)-এর অন্য পিতৃব্য আবু তালেবের উপর এবং কা'বা ঘরের চাবি নিজের কাছে রাখা এবং নির্ধারিত সময়ে তা খুলে দেয়া ও বন্ধ করার ভার ছিল ওসমান ইবনে তালহার উপর।

এ ব্যাপারে স্বয়ং ওসমান ইবনে তালহার ভাষ্য হল এই যে, জাহেলিয়াত আমলে আমরা সোমবার ও বৃহস্পতিবার দিন বায়তুল্লাহর দরজা খুলে দিতাম এবং মানুষ তাতে প্রবেশ লাভের সৌভাগ্য অর্জন করত। হিজরতের পূর্বে একবার মহানবী (সাঃ) কতিপয় সাহাবীসহ বায়তুল্লা হতে প্রবেশের উদ্দেশে তশরীফ নিয়ে গেলে ওসমান (যিনি তখনও পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি) তাঁকে ভেতরে প্রবেশে বাধা দিলেন এবং অত্যন্ত বিরক্তি প্রদর্শন করলেন। কিন্তু মহানবী (সাঃ) অত্যন্ত ধৈর্য ও গাম্ভীর্য সহকারে ওসমানের কটূক্তিসমূহ সহ্য করে নিলেন। অতঃপর বললেন, হে ওসমান! হয়তো তুমি এক সময় বায়তুল্লাহর এই চাবি আমার হাতেই দেখতে পাবে। তখন যাকে ইচ্ছা এই চাবি অর্পণ করার অধিকার আমারই থাকবে। ওসমান ইবনে তালহা বলল, তাই যদি হয়, তবে সেদিন কোরাইশরা অপমানিত অপদস্থ হয়ে পড়বে। হুযুর বললেন, না, তা নয়। তখন কোরাইশরা আযাদ হবে, তারা হবে যথার্থ সম্মানে সম্মানিত। এ কথা বলতে বলতে তিনি বায়তুল্লাহর ভেতরে তশরীফ নিয়ে গেলেন। (ওসমান বলেন), তারপর আমি যখন আমার মনের ভেতর অনুসন্ধান করলাম, তখন আমার যেন নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে গেল যে, তিনি যাকিছু বললেন, তা অবশ্যই ঘটবে। সে মুহূর্তেই আমি মুসলমান হয়ে যাবার সংকল্প নিয়ে নিলাম। কিন্তু আমি আমার সম্প্রদায়ের মতিগতি পরিবর্তিত দেখতে পেলাম। তারা আমাকে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করতে লাগল। কাজেই আমি আর আমার (মুসলমান হওয়ার) সংকল্প বাস্তবায়িত করতে পারলাম না। অতঃপর মক্কা বিজিত হয়ে গেলে পর রসূলে করীম (সাঃ) আমাকে ডেকে বায়তুল্লাহর চাবি চাইলেন। আমি তা পেশ করে দিলাম।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, ওসমান ইবনে তালহা চাবি নিয়ে বায়তুল্লাহর উপরে উঠে গেলেন এবং হযরত আলী (রাঃ) মহানবীর নির্দেশ পালনকল্পে তার নিকট থেকে বলপূর্বক চাবি ছিনিয়ে নিয়ে হুযুরের হাতে অর্পণ করলেন। যাহোক, বায়তুল্লায় প্রবেশ এবং সেখানে নামায আদায় করার পর মহানবী (সাঃ) যখন বাইরে বেরিয়ে এলেন, তখন পুনরায় আমার হাতেই সে চাবি ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেন ঃ এই নাও, এখন থেকে এ চাবি কেয়ামত পর্যন্ত তোমার বংশধরদের হাতেই থাকবে। অন্য যে কেউ তোমাদের হাত থেকে এ চাবি ফিরিয়ে নিতে চাইবে, সে হবে যালেম, অত্যাচারী। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তোমাদের হাত থেকে এ চাবি ফিরিয়ে নেবার কোন অধিকার কারোরই থাকবে না। এতদসঙ্গে তিনি এই হেদায়েত করলেন যে, বায়তুল্লাহ্‌র এই খেদমত তথা সেবার বিনিময়ে তোমরা যে সম্পদ প্রাপ্ত হবে, তা শরীয়তের রীতি মোতাবেক ব্যবহার করবে।

ওসমান ইবনে তালহা বলেন, যখন আমি চাবি নিয়ে হৃষ্টচিত্তে চলে আসছিলাম, তখন তিনি আমাকে ডাকলেন। বললেন, ওসমান, আমি যা বলেছিলাম তাই হল নাকি? তৎক্ষণাৎ আমার সে কথাটি মনে হয়ে গেল, হিজরতের পূর্বে যা তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, "একদিন এ চাবি আমার হাতে দেখতে পারে।" তখন আমি নিবেদন করলাম, নিঃসন্দেহে আপনার কথা বাস্তবায়িত হয়েছে—আর এক্ষণে আমিও কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলাম।— (মাযহারী)

হযরত ফারূকে আ'যম ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেন যে, সেদিন যখন মহানবী (সাঃ) বায়তুল্লাহ থেকে বেরিয়ে আসেন তখন তাঁর মুখে এ আয়াতটি আবৃত হচ্ছিল।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

অর্থাৎ, "আল্লাহ্ তাআলা তোমাদিগকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ তার অধিকারীর নিকট অর্পণ করে দাও।" এ হুকুমের লক্ষ্য সাধারণ মুসলমানরাও হতে পারে কিংবা বিশেষভাবে ক্ষমতাসীন শাসকবর্গও হতে পারেন। তবে সবচেয়ে স্পষ্ট বিষয় হল এই যে, এমন সবাই এর লক্ষ্য যারা আমানতের রক্ষক বা আমানতদার। এতে সাধারণ জনগণ ও শাসকবর্গ সবাই অন্তর্ভুক্ত।

আমানত পরিশোধের তাকীদ ঃ বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে এই যে, যার দায়িত্বে কোন আমানত থাকবে, সে আমানত প্রাপককে পৌঁছে দেয়া তার একান্ত কর্তব্য। রসূলে করীম (সাঃ) আমানত প্রত্যর্পণের ব্যাপারে বিশেষ তাকীদ প্রদান করেছেন। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, এমন খুব কম হয়েছে যে, রসূলে করীম (সাঃ) কোন ভাষণ দিয়েছেন অথচ তাতে একথা বলেননি—

"যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার মধ্যে ইমান নেই।" "আর যার মধ্যে প্রতিশ্রুতি রক্ষার নিয়মানুবর্তিতা নেই, তার ধর্ম নেই।"– (শোআবুল ঈমান)

খেয়ানত মুনাফেকীর লক্ষণ ঃ বোখারী ও মুসলিমের হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) ও হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একদিন মুনাফেকীর লক্ষণসমূহ বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি লক্ষণ এটাও বলেছিলেন যে, যখন তার কাছে কোন আমানত রাখা হয় তখন সে তাতে খেয়ানত করে।

আমানতের প্রকারভেদ ঃ এখানে লক্ষণীয় যে, কোরআন করীম আমানতের বিষয়টিকে امانات বহুবচনে উল্লেখ করেছে। এতে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, কারো নিকট অপর কারো কোন বস্তু বা সম্পদ গচ্ছিত রাখাটাই শুধুমাত্র 'আমানত' নয়, যাকে সাধারণতঃ আমানত বলে অভিহিত করা হয় এবং মনে করা হয় ; বরং আমানতের আরও কিছু প্রকারভেদ রয়েছে। আয়াতের শানে-নুযুল প্রসঙ্গে এখনই যে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, তাও কোন বস্তুগত আমানত ছিল না। কারণ, বায়তুল্লাহ্‌র চাবি বিশেষ কোন বস্তু নয়, বরং তা ছিল বায়তুল্লাহ্‌র খেদমতের একটা পদের নিদর্শন।

রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদাসমূহ আল্লাহ্ তা'আলার আমানতঃ এতে প্রতীয়মান হয়, রাষ্ট্রীয় যত পদ ও পদমর্যাদা রয়েছে, সেসবই আল্লাহ্ তাআলার আমানত। যাদের হাতে নিয়োগ-বরখাস্তের অধিকার রয়েছে সে

সমস্ত কর্মকর্তা ও অফিসারবৃন্দ হলেন সে পদের আমানতদার। কাজেই তাদের পক্ষে কোন পদ এমন কাউকে অর্পণ করা জায়েয নয়, যে লোক তার যোগ্য নয়, বরং প্রতিটি পদের জন্য নিজের ক্ষমতা ও সাধ্যানুযায়ী যোগ্য ব্যক্তির অনুসন্ধান করা কর্তব্য।

কোন পদে অযোগ্য ব্যক্তির নিয়োগকর্তা অভিসম্পাতযোগ্যঃ যোগ্যতা ও পরিপূর্ণ শর্ত মোতাবেক কোন লোক পাওয়া না গেলে উপস্থিত লোকদের মধ্যে যোগ্যতা ও আমানতদারী তথা সততার দিক দিয়ে যে সবচেয়ে অগ্রবর্তী হবে, তাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যাকে সাধারণ মুসলমানদের কোন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তারপর যদি কাউকে তার যোগ্যতা যাচাই ছাড়াই একান্ত বন্ধুত্ব কিংবা সম্পর্কের কারণে কোন পদে নিয়োগ প্রদান করে, তবে তার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত হবে। না তার ফরয (এবাদত) কবুল হবে, না নফল। এমন কি সে জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে।— (জমউল-ফাওয়ায়েদ, ৩২৫ পৃঃ)

ন্যায়বিচার বিশ্ব-শান্তির জামিনঃ আয়াতের প্রথম বাক্যটিতে আমানত পরিশোধের এবং দ্বিতীয় বাক্যে ন্যায়বিচারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে আমানত পরিশোধ বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেয়ার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, এর অবর্তমানে কোথাও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হতেই পারে না। কাজেই যাদের হাতে দেশের শাসনক্ষমতা থাকবে, তাদেরকে প্রথমে গচ্ছিত এই আমানতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে। অর্থাৎ, সরকারী পদসমূহে সেসব লোককেই নিয়োগ করতে হবে যাদেরকে সর্বাধিক যোগ্য বলে মনে করবে। কোন প্রকার স্বজনপ্রীতি, আত্মীয়তার সম্পর্ক কিংবা কোন সুপারিশ অথবা ঘুষ-উৎকোচ যেন কোনক্রমেই প্রশ্রয় পেতে না পারে। অন্যথায় এর ফলে অযোগ্য, অথর্ব, আত্মসাৎকারী ও অত্যাচারী লোক সরকারী পদের অধিকারী হয়ে আসবে। অতঃপর শাসকবর্গ যদি একান্তভাবেও দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা কামনা করেন, তবুও তাদের পক্ষে সে লক্ষ্য অর্জন কোন অবস্থাতেই সম্ভবপর হবে না। কারণ, এসব সরকারী কর্মচারীই হলো সমগ্র রাষ্ট্রের হাত-পা। এরাই যখন অন্যায় ও আত্মসাৎকারী হবে, তখন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার আর কি উপায় থাকবে।

এ আয়াতে বিশেষভাবে একটি কথা স্মরণযোগ্য যে, এতে মহান পরওয়ারদেগার সরকারী পদসমূহকেও আমানত বলে সাব্যস্ত করে প্রথমেই একথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, আমানত যেমন শুধুমাত্র তাদেরকে প্রত্যর্পণ করতে হয় যারা তার প্রকৃত মালিক; কোন ফকীর-মিসকীনকে কারো আমানত দয়াপরবশ হয়ে দিয়ে দেয়া কিংবা কোন আত্মীয়-স্বজন অথবা বন্ধু-বান্ধবের প্রাপ্য হক আদায় করতে গিয়ে অন্য কারো আমানত তাদেরকে দিয়ে দেয়া জায়েয নয়। তেমনিভাবে সরকারী পদ-যার সাথে সর্বসাধারণের অধিকার জড়িত, তাও আমানতেরই অন্তর্ভুক্ত এবং একমাত্র সে সমস্ত লোকই এসব আমানতের অধিকারী, যারা নিজেদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও সামর্থ্যের দিক দিয়ে এসব পদের জন্য উপযোগী এবং উপস্থিত লোকদের মধ্যে উত্তম। আর বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীর দিক দিয়েও যারা অন্যান্যদের তুলনায় অগ্রগণ্য। এদের ছাড়া অন্য কাউকে এসব পদ অর্পণ করা হলে আমানতের মর্যাদা রক্ষিত হবেনা।

এলাকার ভিত্তিতে সরকারী পদ বন্টন ঃ এতদসঙ্গে কোরআনে হাকীম উল্লেখিত বাক্যের দ্বারা সেই সাধারণ ভুলেরও অপনোদন করে দিয়েছে, যা অধিকাংশ দেশের সংবিধানে প্রচলিত রয়েছে যে, সরকারী পদসমূহকে দেশের অধিবাসীবৃন্দের হক বা অধিকার বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

বস্তুতঃ এই মূলনীতিগত ভুলের ভিত্তিতে আইন রচনা করতে হয়েছে যে, সরকারী পদসমূহ জনসংখ্যার ভিত্তিতে বন্টন করা হবে। দেশের প্রত্যেক প্রদেশ বা জেলার জন্য পৃথক পৃথক কোটা নির্ধারিত থাকবে। এক এলাকার কোটায় অপর এলাকার লোক নিয়োগ করা যাবে না, তা প্রার্থী যতই যোগ্য হোক না কেন। পক্ষান্তরে নির্ধারিত এলাকার প্রার্থী যতই অযোগ্য ও অকর্মণ্য হোক না কেন, তাকেই নিয়োগ করতে হবে। কোরআনে হাকীম পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করে দিয়েছে যে, এসব পদ কারোই ব্যক্তিগত বা এলাকাগত অধিকার নয়, বরং এগুলো হলো রাষ্ট্রীয় আমানত, যা শুধুমাত্র এর যোগ্য প্রাপককেই অর্পণ করা যেতে পারে, তা সে যে কোন এলাকারই হোক। অবশ্য কোন বিশেষ এলাকা বা প্রদেশের শাসনকল্পে সে এলাকার মানুষকে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে, যাতে বহুবিধ কল্যাণ নিহিত থাকবে। কিন্তু তাতে শর্ত হলো এই যে, কাজের যোগ্যতা এবং আমানতদারীর ব্যাপারে তার উপর পূর্ণ আস্থা থাকতে হবে।

সংবিধান সম্পর্কিত কয়েকটি মূলনীতিঃ এভাবে এই সংক্ষিপ্ত আয়াতে সংবিধান সম্পর্কিত কয়েকটি মৌলিক নীতির আলোচনাও এসে গেছে। সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

(১) প্রথমতঃ আয়াতের প্রথম বাক্য إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ —এর দ্বারা আরম্ভ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রকৃত হুকুম ও নির্দেশ দানের মালিক আল্লাহ্ তাআলা। পৃথিবীর শাসকবর্গ তাঁর আজ্ঞাবহ। এতে প্রতীয়মান হয় যে, শাসনক্ষেত্রে সার্বভৌমত্বের মালিকও একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই।

(২) দ্বিতীয়তঃ সরকারী পদসমূহ দেশের অধিবাসীদের অধিকার নয়, যা জনসংখ্যার হারে বন্টন করা যেতে পারে ; বরং এগুলো হল আল্লাহ্ প্রদত্ত আমানত, যা শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট দায়িত্বের পক্ষে যোগ্য ও যথার্থ লোককেই দেওয়া যেতে পারে।

(৩) তৃতীয়তঃ পৃথিবীতে মানুষের যে শাসন, তা শুধুমাত্র একজন প্রতিনিধি ও আমানতদার হিসেবেই হতে পারে। তারা দেশের আইন প্রণয়নে সে সমস্ত নীতিমালার অনুসরণে বাধ্য থাকবে যা একক ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে বাতলে দেয়া হয়েছে।

(৪) চতুর্থতঃ তাদের নিকট যখন কোন মোকদ্দমা আসবে, তখন বংশ, গোত্র, বর্ণ, ভাষা এমন কি ধর্ম ও মতবাদের পার্থক্য না করে সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত মীমাংসা করে দেয়া শাসন কর্তৃপক্ষের উপর ফরয।

এ আয়াতে রাষ্ট্রীয় সংবিধানের এসব মূলনীতি বর্ণনার পর এরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ্ তোমাদিগকে যে উপদেশ দিয়েছেন, তা খুবই উত্তম। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা সবার ফরিয়াদই শোনেন এবং যে লোক বলার কিংবা ফরিয়াদ করার সামর্থ্য রাখে না, তিনি তার অবস্থাও উত্তমভাবে দেখেন। অতএব, তাঁর রচিত নীতিমালাই সর্বদা সকল রাষ্ট্রের জন্য সর্বযুগে উপযোগী হতে পারে। পক্ষান্তরে মানবরচিত নীতিমালা ও সংবিধান

শুধুমাত্র নিজেদের পরিবেশেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেগুলোরও পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

প্রথম আয়াতের লক্ষ্য যেমন শাসনকর্তৃপক্ষ ছিল, তেমনি দ্বিতীয় আয়াতে সাধারণ মানুষকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্, রসূল এবং তোমাদের সচেতন নেতৃবর্গের অনুসরণ কর।

'উলিল আমর' কাকে বলা হয় ঃ 'উলিল-আমর' আভিধানিক অর্থে সে সমস্ত লোককে বলা হয়, যাদের হাতে কোন বিষয়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত থাকে। সে কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও হাসান বসরী (রঃ) প্রমুখ মুফাসসেরগণ ওলামা ও ফোকাহা সম্প্রদায়কে 'উলিল-আমর' সাব্যস্ত করেছেন। তাঁরাই হচ্ছেন মহানবী (সাঃ)-এর নায়েব বা প্রতিনিধি। তাঁদের হাতেই দ্বীনী ব্যবস্থাপনা দায়িত্ব অর্পিত।

মুফাসসেরীনের অপর এক জামাআত—যাদের মধ্যে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামও রয়েছেন—বলেছেন যে, 'উলিল-আমর'-এর অর্থ হচ্ছে সে সমস্ত লোক যাদের হাতে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত।

এছাড়া তফসীরে-ইবনে-কাসীর এবং তফসীরে-মাযহারীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ শব্দটির দ্বারা (ওলামা ও শাসক) উভয় শ্রেণীকেই বোঝায়। কারণ, নির্দেশ দানের বিষয়টি তাঁদের উভয়ের সাথেই সম্পর্কিত।

এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার পেছনে একটি বিশেষ ঘটনা রয়েছে। তা এই যে, বিশ্‌র নামক এক মুনাফেক ছিল। কোন এক ইহুদীর সাথে তার বিবাদ বেধে যায়। ইহুদী লোকটি বলল, চল মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে গিয়ে এর মীমাংসা করিয়ে নেই। কিন্তু মুনাফেক বিশ্‌র এ প্রস্তাবে সম্মত হল না। বরং সে কা'ব ইবনে আশরাফ নামক ইহুদীর কাছে গিয়ে মীমাংসা করাবার প্রস্তাব করল। কা'ব ইবনে আশরাফ ছিল ইহুদীদের একজন সর্দার এবং রসূলে করীম (সাঃ) ও মুসলমানদের কঠিন শত্রু। কাজেই বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিষয়টি ছিল একান্তই বিস্ময়কর যে, ইহুদী নিজেদের সর্দারকে বাদ দিয়ে মহানবী (সাঃ)-এর মীমাংসাকে পছন্দ করছিল, অথচ নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয়দানকারী বিশ্‌র হুযুরের স্থলে ইহুদী সর্দারের মীমাংসা গ্রহণ করছিল! কিন্তু এর পেছনে রহস্য ছিল এই যে, তাদের উভয়ের মনেই এ বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল যে, রসূলে করীম (সাঃ) যে মীমাংসা করবেন তা একান্তই ন্যায়সঙ্গত করবেন। আর তাতে কারোই পক্ষপাতিত্বের কোন সন্দেহ-সংশয় ছিল না। কিন্তু যেহেতু বিরোধীয় বিষয়ে ইহুদী লোকটি ছিল ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই তার নিজেদের সর্দার অপেক্ষাও বেশী বিশ্বাস ছিল মহানবী (সাঃ)-এর উপর। পক্ষান্তরে মুনাফেক বিশর ছিল অন্যায়ের উপর। সে জন্য সে জানত যে, মহানবীর মীমাংসা তার বিরুদ্ধেই যাবে, যদিও আমি মুসলমান বলে পরিচিত।

যাহোক, এতদুভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটির পর মহানবী (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিজেদের বিষয় তাঁরই মাধ্যমে মীমাংসা করার সিদ্ধান্ত হল। অতঃপর মহানবী (সাঃ) মোকদ্দমার বিষয় অনুসন্ধান করলেন। তাতে ইহুদীর অধিকার প্রমাণিত হয় এবং তিনি তারই পক্ষে ফয়সালা করে দিলেন। আর বাহ্যিকভাবে মুসলমান বিশ্‌রকে প্রত্যাখ্যান করলেন। এতে সে এ মীমাংসা মেনে নিতে অসম্মত হল এবং নতুন এক পন্থা উদ্ভাবন করল যে, কোনক্রমে ইহুদীকে রাযী করিয়ে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবের নিকট মীমাংসা করাতে নিয়ে যাবে। ইহুদীও তাতে সম্মত হয়। এর পেছনে রহস্য ছিল এই যে, বিশ্‌র মনে করেছিল, যেহেতু হযরত ওমর কাফেরদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠিন, কাজেই তিনি ইহুদীর পক্ষে রায় দেয়ার পরিবর্তে আমারই পক্ষে রায় দেবেন।

তাদের দু'জনই হযরত ওমর ফারূকের নিকট হাযির হল। ইহুদী লোকটি ফারূকে আযমের নিকট সমগ্র ঘটনা বিবৃত করে জানাল যে, এ মোকদ্দমার ফয়সালা হুযুর (সাঃ)-ও করেছেন, কিন্তু তাতে এ লোকটি সম্মত নয়। ফলে আপনার নিকট এসেছি।

হযরত ওমর বিশ্‌রকে জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনাটি কি তাই? সে স্বীকার করল। তখন হযরত ফারূকে আযম বললেন, তাহলে একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনই আসছি। একথা বলে তিনি ঘরের ভেতর থেকে একটি তলোয়ার নিয়ে এলেন এবং মুনাফেক লোকটিকে সাবাড় করে দিলেন। তিনি বললেন, যে লোক রসূলের (সাঃ) ফয়সালা মানতে রাযী নয়, এই হল তার মীমাংসা। (ঘটনাটি ছা'লাবী, ইবনে আবী হাতেম ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতক্রমে রূহুল মা'আনীতে বর্ণিত রয়েছে।)

সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরকারগণ এতদসঙ্গে একথাও লিখেছেন যে, এরূপ নিহত মুনাফেকের ওয়ারিসানরা হযরত ওমর (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের করেছিল যে, তিনি শরীয়তসিদ্ধ কোন দলীল ছাড়াই একজন মুসলমানকে হত্যা করেছেন। তদুপরি নিহত লোকটিকে মুসলমান বলে প্রমাণ করার জন্য তার কথা ও কার্যগত কুফরীর বিভিন্ন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করল। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ঘটনার প্রকৃত তাৎপর্য এবং নিহত ব্যক্তির মুনাফেক হওয়ার কথা প্রকাশ করে হযরত ওমরকে মুক্ত করে দিয়েছেন।

طاغوت শব্দের অর্থ ঔদ্ধত্য প্রকাশকারী। আর প্রচলিত অর্থে 'তাগূত' বলা হয় শয়তানকে। এ আয়াতে বিরোধীয় বিষয়টিকে কা'ব ইবনে আশরাফের নিকট নিয়ে যাওয়াকে শয়তানের নিকট নিয়ে যাওয়া সাব্যস্ত করা হয়েছে। তা এ কারণে যে, কা'ব নিজেই ছিল এক শয়তান। কিংবা এ কারণে যে, শরীয়তের ফয়সালা বর্জন করে শরীয়ত বিরোধী মীমাংসার দিকে ধাবিত হওয়া শয়তানেরই শিক্ষা হতে পারে। বস্তুতঃ যে লোক সে শিক্ষার অনুসরণ করেছে সে শয়তানেরই নিকট যেন নিজের মোকদ্দমা নিয়ে গেছে। সেজন্য আয়াতের শেষাংশে হেদায়েত দান করা হয়েছে যে, যে লোক শয়তানের অনুসরণ করবে, শয়তান তাকে পথভ্রষ্টতার সুদূর প্রান্তে নিয়ে যাবে।

দ্বিতীয় আয়াতে বাতলে দেয়া হয়েছে যে, পারস্পরিক বিরোধ বিসংবাদের সময় রসূলে করীম (সাঃ) কৃত মীমাংসাকে অমান্য করা কোন মুসলমানের কাজ হতে পারে না। যে কেউ এমন কাজ করবে, সে মুনাফেক ছাড়া আর কিছু নয়। আর যখন সে মুনাফেকের কাফের হওয়া কার্যতঃ এভাবে প্রকাশ হয়ে পড়েছিল যে, সে মহানবী (সাঃ)-এর মীমাংসায় সম্মত হয়নি, তখন হযরত ফারূকে আযম কর্তৃক তাকে হত্যা করাও বৈধ হয়ে যায়। কারণ, তখন আর সে মুনাফেক থাকেনি, বরং প্রকাশ্য মুর্তাদ হয়ে যায়। কাজেই বলা হয়েছে— এরা এমন লোক, যারা

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ
رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ۚ ﴿٦١﴾ فَكَيْفَ اِذَآ
اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ثُمَّ جَآءُوْكَ
يَحْلِفُوْنَ ۖ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدْنَآ اِلَّآ اِحْسَانًا وَّتَوْفِيْقًا ﴿٦٢﴾ اُولٰٓئِكَ
الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۗ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ
وَقُلْ لَّهُمْ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَوْلًا ۢ بَلِيْغًا ﴿٦٣﴾ وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ
رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ
جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ
لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿٦٤﴾ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ
حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ
حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٦٥﴾ وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا
عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَّا
فَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ ۗ وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ
بِهٖ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَشَدَّ تَثْبِيْتًا ﴿٦٦﴾ وَّاِذًا لَّاٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ
لَّدُنَّآ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٦٧﴾ وَّلَهَدَيْنٰهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿٦٨﴾

(৬১) আর যখন আপনি তাদেরকে বলবেন, আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে এসো—যা তিনি রসূলের প্রতি নাযিল করেছেন, তখন আপনি মুনাফেকদিগকে দেখবেন, ওরা আপনার কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে যাচ্ছে। (৬২) এমতাবস্থায় যদি তাদের কৃতকর্মের দরুন বিপদ আরোপিত হয়, তবে তাতে কি হল! অতঃপর তারা আপনার কাছে আল্লাহ্‌র নামে কসম খেয়ে খেয়ে ফিরে আসবে যে, মঙ্গল ও সম্প্রীতি ছাড়া আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। (৬৩) এরা হলো সে সমস্ত লোক, যাদের মনের গোপন বিষয় সম্পর্কেও আল্লাহ্ তা'আলা অবগত। অতএব, আপনি ওদেরকে উপেক্ষা করুন এবং ওদেরকে সদুপদেশ দিয়ে এমন কোন কথা বলুন যা তাদের জন্য কল্যাণকর। (৬৪) বস্তুতঃ আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি, যাতে আল্লাহ্‌র নির্দেশানুযায়ী তাঁদের আদেশ-নিষেধ মান্য করা হয়। আর সেসব লোক যখন নিজেদের অনিষ্ট সাধন করেছিল, তখন যদি আপনার কাছে আসত অতঃপর আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রসূলও যদি তাদেরকে ক্ষমা করিয়ে দিতেন, অবশ্যই তারা আল্লাহকে ক্ষমাকারী, মেহেরবানরূপে পেত। (৬৫) অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে! অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে। (৬৬) আর যদি আমি তাদের নির্দেশ দিতাম যে, নিজেদের প্রাণ ধ্বংস করে দাও কিংবা নিজেদের নগরী ছেড়ে বেরিয়ে যাও, তবে তারা তা করত না; অবশ্য তাদের মধ্যে অল্প কয়েকজন। যদি তারা তাই করে যা তাদের উপদেশ দেয়া হয়, তবে তা অবশ্যই তাদের জন্য উত্তম এবং তাদেরকে নিজের ধর্মের উপর সুদৃঢ় রাখার জন্য তা উত্তম হবে। (৬৭) আর তখন অবশ্যই আমি তাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে মহান সওয়াব দেব। (৬৮) আর তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করব।

তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা সে নির্দেশের প্রতি চলে এসো, যা আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করেছেন এবং চলে এসো তাঁর রসূলের দিকে, তখন এসব মুনাফেক আপনার দিকে আসতে অনীহা প্রকাশ করে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

রসূল করীম (সাঃ)-এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা কুফর : এ আয়াতে রসূল করীম (সাঃ)-এর মহত্ত্ব ও সুউচ্চ মর্যাদার বিষয় প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে কোরআনের অসংখ্য আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত মহানবী (সাঃ)-এর আনুগত্যের অপরিহার্যতার বিষয়টি সবিস্তারে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা কসম খেয়ে বলেছেন যে, কোন মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন কিংবা মুসলমান হতে পারে না যতক্ষণ না সে ধীরস্থির মস্তিষ্কে মহানবী (সাঃ)-কে এভাবে স্বীকার করে নেবে যাতে তাঁর কোন সিদ্ধান্তেই মনে কোন রকম সংকীর্ণতা না থাকে।

মহানবী (সাঃ) রসূল হিসাবে গোটা উম্মতের শাসক এবং যে কোন বিবাদের মীমাংসার যিম্মাদার। তাঁর শাসন ও সিদ্ধান্ত অপর কাউকে বিচারক সাব্যস্ত করার উপর নির্ভরশীল নয়। তার পরেও এ আয়াতে মুসলমানগণকে বিচারক সাব্যস্ত করে নিতে বলা হয়েছে। তার কারণ, সরকারীভাবে সাব্যস্তকৃত বিচারক এবং তার মীমাংসার উপর অনেকেরই সন্তুষ্টি আসে না, যেমনটি আসে নিজের মনোনীত বা সাব্যস্তকৃত সালিস বা বিচারকের উপর। কিন্তু মহানবী (সাঃ) শুধুমাত্র একজন শাসকই নন, বরং তিনি একজন নিষ্পাপ রসূল, রাহমাতুল লিল-আলামীন এবং উম্মতের জন্য একান্ত দয়ালু পিতাও বটেন। কাজেই শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, যখনই কোন বিষয়ে, কোন সমস্যার ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেয়, তখনই রসূলে মকবুল (সাঃ)-কে বিচারক সাব্যস্ত করে তার মীমাংসা করিয়ে নেয়া এবং অতঃপর তাঁর মীমাংসাকে স্বীকার করে নিয়ে সেমতে কাজ করা উভয় পক্ষের উপর ফরয।

মতবিরোধের ক্ষেত্রে মহানবী (সাঃ)-কে বিচারক সাব্যস্ত করা : কোরআনের তফসীরকারগণ বলেছেন যে, কোরআনের বাণীসমূহের উপর আমল করা মহানবী (সাঃ)-এর যুগের সাথেই সীমিত নয়। তাঁর তিরোধানের পর তাঁর পবিত্র শরীয়তের মীমাংসাই হল তাঁর মীমাংসা। কাজেই এ নির্দেশটি কেয়ামত পর্যন্ত তেমনিভাবে বলবৎ থাকবে, যেমন ছিল তাঁর যুগে। তখন যেমন সরাসরি (কোন বিষয়ের সিদ্ধান্তকল্পে) তাঁর কাছে উপস্থিত করা হত, তেমনি তাঁর পরে তাঁর শরীয়তের মীমাংসা নিতে হবে। আর এটা প্রকৃতপক্ষে তাঁরই অনুসরণ।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল : প্রথমতঃ সে ব্যক্তি আদৌ মুসলমান নয়, যে নিজের যাবতীয় বিবাদ ও মোকদ্দমায় রসূলে করীম (সাঃ)-এর মীমাংসায় সন্তুষ্ট হতে পারে না। সে কারণেই হযরত ফারুকে আযম (রাঃ) সে লোকটিকে হত্যা করে ফেলেছিলেন, যে মহানবী (সাঃ)-এর মীমাংসায় রাযী হয়নি এবং পুনরায় বিষয়টি ফারুকে আযমের দরবারে নিয়ে গিয়েছিল। এই নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসবর্গ রসূলে করীম (সাঃ)-এর আদালতে হযরত ওমর ফারুকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে যে, তিনি একজন মুসলমানকে অকারণে হত্যা করেছেন। এই মামলা হুযুরের দরবারে উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে **ما كنت اظن ان عمر يجترئ على قتل رجل مؤمن** (অর্থাৎ, আমার ধারণা ছিল না যে, ওমর কোন মুমিনকে হত্যার সাহস করতে পারবে।) এতে প্রমাণিত হয় যে, উচ্চতর বিচারকের নিকট যদি কোন অধঃস্তন বিচারকের মীমাংসার ব্যাপারে আপীল করা হয়, তবে

তাঁকে স্বীয় অধঃস্তন বিচারকের পক্ষপাতিত্ব করার পরিবর্তে ন্যায়ভিত্তিক মীমাংসা করা কর্তব্য। যেমন, এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে মহানবী (সাঃ) হযরত ওমরের মীমাংসার বিরুদ্ধে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। অতঃপর যখন এ আয়াত নাযিল হয়, তখন বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ আয়াতের ভিত্তিতে সে লোক মুমিনই ছিল না।

দ্বিতীয় মাসআলাঃ এ আয়াতের দ্বারা এ বিষয়ও প্রমাণিত হয় যে, فِيْمَا شَجَرَ বাক্যটি শুধু আচার-অনুষ্ঠান কিংবা অধিকারের সাথেই সম্পৃক্ত নয় ; আকীদা, মতবাদ এবং অপরাপর বৈষয়িক বিষয়েও ব্যাপক।—(বাহ্‌রে মুহীত) অতএব, কোন সময় কোন বিষয়ে পারস্পরিক মতবিরোধ দেখা দিলে বিবাদ পরিহার করে উভয়পক্ষকে রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট এবং তাঁর অবর্তমানে তৎপ্রবর্তিত শরীয়তের আশ্রয়ে গিয়ে মীমাংসা অন্বেষণ করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয।

তৃতীয় মাসআলা ঃ এতে একথাও জানা গেল যে, যে কাজ বা বিষয় মহানবী (সাঃ) কর্তৃক কথা বা কাজের মাধ্যমে প্রমাণিত, তা সম্পাদন করতে গিয়ে মনে কোন রকম সংকীর্ণতা অনুভব করাও ঈমানের দুর্বলতার লক্ষণ। উদাহরণতঃ যেক্ষেত্রে শরীয়ত তায়াম্মুম করে নামায পড়ার অনুমতি দিয়েছে, সেক্ষেত্রে তায়াম্মুম করতে কেউ যদি সম্মত না হয়, তবে একে পরহেযগারী বলে মনে করা যাবে না, বরং এটা একান্তই মানসিক ব্যাধি। রসূলে করীম (সাঃ) অপেক্ষা কেউ বেশী পরহেযগার হতে পারে না। যে অবস্থায় মহানবী (সাঃ) বসে নামায পড়ার অনুমতি দিয়েছেন এবং নিজেও বসে নামায আদায় করেছেন, কারো মন যদি এতে সম্মত না হয় এবং অসহনীয় পরিশ্রম ও কষ্ট সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে নামায পড়ে, তবে তার জেনে রাখা উচিত যে, তার মন ব্যাধিগ্রস্ত। অবশ্য সাধারণ প্রয়োজন কিংবা কষ্টের সময় যদি প্রদত্ত অব্যাহতিকে পরিহার করে কষ্টের উপর আমল করে, তবে তা মহানবীর শিক্ষা অনুসারেই বৈধ। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই শরীয়ত প্রদত্ত অব্যাহতির প্রতি সংকীর্ণতা অনুভব করা তাকওয়া নয়।

একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ বিগত বিশ্লেষণের দ্বারা এ বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, রসূলে করীম (সাঃ) তাঁর উম্মতের জন্য শুধুমাত্র একজন সংস্কারক এবং নৈতিক পথপ্রদর্শকই ছিলেন না, বরং তিনি একজন ন্যায়নিষ্ঠ বিচারকও ছিলেন। তদুপরি এমন শাসকও ছিলেন যাঁর সিদ্ধান্তকে ঈমান ও কুফরের মানদন্ড সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন, মুনাফেক বিশ্‌রের ঘটনার দ্বারা প্রমাণ হয়। আর এ বিষয়টি বিশ্লেষণের উদ্দেশেই আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় পবিত্র গ্রন্থের একাধিক জায়গায় স্বীয় আনুগত্যের সাথে সাথে রসূলে করীম (সাঃ)-এর আনুগত্যকেও অপরিহার্য বলে অভিহিত করেছেন।

কা'আব ইবনে আশরাফ ইহুদীকে প্রস্তাব করে এবং পরে বাধ্য হয়ে মহানবী (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়। আর হুযুর আকরাম (সাঃ)-এর মীমাংসা যেহেতু তার বিরুদ্ধে হয়েছিল, সেহেতু সে তাতে আশ্বস্ত না হয়ে বরং পুনর্বার মীমাংসা করার জন্য হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে উপস্থিত হল। এ ঘটনা মদীনায় জানাজানি হয়ে গেলে ইহুদীরা মুসলমানগণকে ধিক্কার দিতে লাগল। পূর্ব কারণে আলোচিত বিশ্‌র ইবনে আহবারের ঘটনা মদীনায় জানাজানি হয়ে গেলে ইহুদীরা মুসলমানদেরকে এই বলে ভর্ৎসনা করত যে, তোমরা কেমন মানুষ! যাকে তোমরা রসূল বলে মান্য কর এবং তার অনুসরণ কর বলেও দাবী কর, তাঁর মীমাংসাসমূহকে স্বীকার কর না! ইহুদীদের প্রতি লক্ষ্য কর, তাদের গোনাহের তওবাকল্পে তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছিল যে, তোমাদের মধ্য থেকে একে অপরকে হত্যা কর, আমরা এহেন কঠিন নির্দেশ পর্যন্ত পালন করেছি। এমন কি এভাবে আমাদের সত্তর ব্যক্তি নিহত হয়। তোমাদেরকে যদি এমন কোন হুকুম দেয়া হত, তবে তোমরা কি করতে? আয়াতটিতে তারও উত্তর দেয়া হয়েছে যে, এই অবস্থা মুনাফেকদেরই হতে পারে, পাকা মুসলমানদের নয়। তার প্রমাণ হলো, এ আয়াত যখন অবতীর্ণ হয়, তখন সাহাবায়ে-কেরামের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন) মধ্য থেকে একজন বললেন, আল্লাহ্ আমাদিগকে এহেন (কঠিন) পরীক্ষার সম্মুখীন করেননি। সাহাবীর এ বাক্যটি রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বললেন, "আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যাদের অন্তরে পাহাড়ের মত সুদৃঢ় মজবুত ঈমান রয়েছে।" ইবনে ওহাব বলেন যে, এ বাক্য হল হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর।

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এ আয়াত শুনে বলেছিলেন যে, আল্লাহ্‌র কসম, এ হুকুম নাযিল হলে আমি নিজেকে এবং নিজের পরিবার-পরিজনকে এর জন্য কোরবান করে দিতাম। অবশ্য সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) দেশত্যাগের নির্দেশ আমল করে দেখিয়েও দিয়েছেন। তাঁরা স্বীয় জন্মভূমি মক্কা, নিজেদের সমস্ত সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিত্যাগ করে মদীনা অভিমুখে হিজরত করেছিলেন।

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ
اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ
وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ﴿٦٩﴾ ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ط وَكَفٰى
بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ﴿٧٠﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا
ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا ﴿٧١﴾ وَاِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ ج فَاِنْ
اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالَ قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ اِذْ لَمْ اَكُنْ مَّعَهُمْ
شَهِيْدًا ﴿٧٢﴾ وَلَئِنْ اَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ لَيَقُوْلَنَّ كَاَنْ لَّمْ
تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهٗ مَوَدَّةٌ يّٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ مَعَهُمْ فَاَفُوْزَ
فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٧٣﴾ فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ
الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ط وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٧٤﴾ وَمَا لَكُمْ
لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ
وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا
مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ج وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ
لَّدُنْكَ وَلِيًّا ج وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ﴿٧٥﴾

(৬৯) আর যে কেউ আল্লাহ্‌র হুকুম এবং তাঁর রসূলের হুকুম মান্য করবে, তাহলে যাঁদের প্রতি আল্লাহ্‌ নেয়ামত দান করেছেন, সে তাঁদের সঙ্গী হবে। তাঁরা হলেন নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাঁদের সান্নিধ্যই হল উত্তম। (৭০) এটা হল আল্লাহ্‌-প্রদত্ত মহত্ব। আর আল্লাহ্‌ যথেষ্ট পরিজ্ঞাত। (৭১) হে ঈমানদারগণ! নিজেদের অস্ত্র তুলে নাও এবং পৃথক পৃথক সৈন্যদলে কিংবা সমবেতভাবে বেরিয়ে পড়। (৭২) আর তোমাদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ রয়েছে, যারা অবশ্য বিলম্ব করবে এবং তোমাদের উপর কোন বিপদ উপস্থিত হলে বলবে, আল্লাহ্‌ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি তাদের সাথে যাইনি। (৭৩) পক্ষান্তরে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন অনুগ্রহ আসলে তারা এমনভাবে বলতে শুরু করবে যেন তোমাদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে কোন মিত্রতাই ছিল না। (বলবে) হায়, আমি যদি তাদের সাথে থাকতাম, তাহলে আমিও যে সফলতা লাভ করতাম। (৭৪) কাজেই আল্লাহ্‌র কাছে যারা পার্থিব জীবনকে আখেরাতের পরিবর্তে বিক্রি করে দেয় তাদের জেহাদ করাই কর্তব্য। বস্তুতঃ যারা আল্লাহ্‌র রাহে লড়াই করে এবং অতঃপর মৃত্যুবরণ করে কিংবা বিজয় অর্জন করে, আমি তাদেরকে মহাপুণ্য দান করব। (৭৫) আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহ্‌র রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

জান্নাতের পদমর্যাদাসমূহ আমলের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে ঃ যে সমস্ত লোক আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের নির্দেশিত বিষয়ের উপর আমল করবেন এবং আল্লাহ্‌ ও রসূলের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকবেন, তাঁদের পদমর্যাদা তাঁদেরই আমল তথা কৃতকর্ম অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। প্রথম শ্রেণীর লোকদেরকে আল্লাহ্‌ তাআলা নবী-রসূলগণের সাথে জান্নাতের উচ্চতর স্থানে জায়গা দেবেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদিগকে নবীগণের পরবর্তী মর্যাদার লোকদের সাথে স্থান দেবেন। তাঁদেরকেই বলা হয় ছিদ্দীকীন। অর্থাৎ, তাঁরা হলেন সুউচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবায়ে কেরাম, যাঁরা কোন রকম দ্বিধা-সংকোচ ও বিরোধিতা না করে প্রাথমিক পর্যায়েই ঈমান এনেছেন। যেমন, হযরত আবু বকর (রাঃ) প্রমুখ। অতঃপর তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা থাকবেন শহীদগণের সাথে। শহীদ সে সমস্ত লোককে বলা হয়, যাঁরা আল্লাহ্‌র রাহে নিজেদের জান-মাল কোরবান করে দিয়েছেন। আর চতুর্থ শ্রেণীর লোকগণ থাকবেন সালেহীনদের সাথে। বস্তুতঃ সালেহীন হলেন সেসব লোক, যাঁরা জাহের ও বাতেন, প্রকাশ্য ও গোপন সব ক্ষেত্রেই সৎকর্মসমূহের যথাযথ অনুবর্তী।

সারকথা, আল্লাহ্‌ তাআলার আনুগত্যশীল বান্দাগণ সে সমস্ত মহান ব্যক্তিদের সাথে থাকবেন, যাঁরা আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ও মকবুল।

জান্নাতে দেখা সাক্ষাতের কয়েকটি দিক ঃ (১) নিজ নিজ অবস্থানে থেকেই একে অন্যকে দেখবেন। যেমন, মুয়াত্তা ইমাম মালেক গ্রন্থে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ জান্নাতবাসীরা নিজেদের জানালা দিয়ে উপরের শ্রেণীর লোকদেরকে তেমনিভাবে দেখতে পাবে, যেমন পৃথিবীতে তোমরা তাদেরকে দেখ।

(২) উপরের শ্রেণীর লোকেরা নীচের শ্রেণীতে নেমে এসেও সাক্ষাৎ করবেন। যেমন, হযরত ইবনে জরীর (রহঃ) হযরত রবী' (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে এরশাদ করেছেন যে, উপরের শ্রেণীর লোকেরা নীচের শ্রেণীতে নেমে আসবেন এবং তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ও উঠা-বসা হবে।

তাছাড়া নীচের শ্রেণীর অধীবাসীদের জন্য উপরের শ্রেণীতে যাওয়ার অনুমতি লাভও হতে পারে। আলোচ্য আয়াতের প্রেক্ষিতে রসূলে করীম (সাঃ) বহু লোককে জান্নাতে নিজের সাথে অবস্থানের সুসংবাদ দিয়েছেন।

প্রেম নৈকট্যের শর্ত ঃ হুযূরে আকরাম (সাঃ)-এর সান্নিধ্য ও নৈকট্য তাঁর সাথে প্রেম ও মহব্বতের মাধ্যমেই লাভ হবে। সহীহ বোখারীতে হাদীসে মুতাওয়াতেরায় সাহাবায়ে কেরামের এক বিপুল জামাআত কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে ঃ রসূলে করীম (সাঃ)-কে একবার জিজ্ঞাসা করা হল যে, "সে লোকটির মর্যাদা কেমন হবে, যে লোক কোন জামাত বা দলের সাথে ভালবাসা পোষণ করে, কিন্তু আমলের বেলায় এদলের নির্ধারিত মান পর্যন্ত পৌছতে পারেনি?" হুযূর (সাঃ) বললেন, المرء مع من احب অর্থাৎ, হাশরের মাঠে প্রতিটি লোকই যার সাথে তার ভালবাসা, তার সাথে থাকবে।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, পৃথিবীতে কোন কিছুতেই আমি এতটা আনন্দিত হইনি যতটা এ হাদীসের কারণে আনন্দিত হয়েছি। কারণ, এ হাদীসে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর সাথে যাঁদের

গভীর ভালবাসা রয়েছে তাঁরা হাশরের মাঠেও হুযূরের সাথেই থাকবেন।

রসূলে করীম (সাঃ)-এর সান্নিধ্য লাভ কোন বর্ণ-গোত্রের উপর নির্ভরশীল নয় ঃ তিব্‌রানী (রহঃ) জামে কবীর গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর এ রেওয়ায়েতটি উদ্ধৃত করেছেন যে, জনৈক হাবশী ব্যক্তি মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে এসে নিবেদন করলেন,— "ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনি আমাদের চাইতে আকার-আকৃতি, রং উভয় দিক দিয়েই সুন্দর ও অনন্য এবং নবুওয়তের দিক দিয়েও। এখন যদি আমি এ ব্যাপারেও ঈমান নিয়ে আসি, যাতে আপনার ঈমান রয়েছে এবং সেরূপ আমলও করি, যা আপনি করে থাকেন, তাহলে কি আমিও জান্নাতের মাঝে আপনার সাথে থাকতে পারব"।

মহানবী (সাঃ) বললেন, "হাঁ, অবশ্যই। তুমি তোমার হাবশীসুলভ কদাকৃতির জন্য চিন্তিত হয়ো না। সে সত্তার কসম, যাঁর মুঠোয় আমার প্রাণ, জান্নাতের মাঝে কাল রংয়ের হাবশীও সাদা ও সুন্দর হয়ে যাবে এবং এক হাজার বছরের দূরত্বে থেকেও চমকাতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' (কলেমায়) বিশ্বাসী হবে, তার মুক্তি ও কল্যাণ আল্লাহ্‌র দায়িত্বে এসে যায়। আর যে লোক 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' পড়ে, তার আমলনামায় একলক্ষ চব্বিশ হাজার নেকী লেখা হয়"।

সিদ্দীক-এর সংজ্ঞা ঃ দ্বিতীয় স্তর হল সিদ্দিকীনের। আর সিদ্দীক হলেন সে সমস্ত লোক যাঁরা মা'রেফত বা আল্লাহ্ তাআলার পরিচয় লাভের ক্ষেত্রে নবীগণের কাছাকাছি। এর উদাহরণ এই যে, কোন লোক যেন কোন বস্তুকে দূর থেকে অবলোকন করছে। হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট কোন এক লোক জিজ্ঞেস করলেন যে, "আপনি কি আল্লাহ্ তাআলাকে দেখেছেন?" তিনি বলেছিলেন, "আমি এমন কোন কিছুর এবাদত করতে পারি না, যা আমি দেখিনি।" অতঃপর আরো বললেন,— "আল্লাহ্‌কে মানুষ স্বচক্ষে দেখেনি সত্য, কিন্তু মানুষের অন্তর ঈমানের আলোকে তাঁকে উপলব্ধি করে নেয়।" এখানে 'দেখা' বলতে হযরত আলী (রাঃ)-এর উদ্দেশ্য হল স্বীয় জ্ঞানের গভীরতা সূক্ষ্মতার মাধ্যমে দেখার মতই উপলব্ধি করে নেয়া।

শহীদের সংজ্ঞা ঃ তৃতীয় স্তর হল শহীদগণের। আর শহীদ হলেন সে সমস্ত লোক, যাঁরা বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হন; তাঁরা তা প্রত্যক্ষ করেন না। তাঁদের উদাহরণ হল এমন, যেন কোন লোক কোন বস্তুকে আয়নার কাছে থেকে অবলোকন করছে। যেমন, হযরত হারেসা (রাঃ) বলেছেন, "আমার মনে হয় আমি যেন আমার মহান পরওয়ারদেগারের আরশ প্রত্যক্ষ করছি।"

তাছাড়া ان تعبد الله كانك تراه হাদীসটিতেও এমন ধরনের দেখার কথা বলা হয়েছে।

সালেহীনের সংজ্ঞা ঃ চতুর্থ স্তর হল সালেহীনের। যাঁরা নিজেদের উদ্দেশ্য-লক্ষ্যকে অনুসরণ ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিশ্চিত জেনে নেন। তাদের উদাহরণ হলো, কোন বস্তুকে দূরে থেকে আয়নার মধ্যে দেখা। আর হাদীসে فان لم تكن تراه فانه يراك যে বলা হয়েছে, তাতেও দেখা বা প্রত্যক্ষ করার এই স্তরের কথাই বোঝানো হয়েছে। ইমাম রাগেব ইস্পাহানীর এই পর্যালোচনার সার-নির্যাস হচ্ছে, এগুলোই হল 'মা' রেফতে-রব' বা আল্লাহ্ তাআলার পরিচয় লাভের স্তর। বস্তুতঃ এই মা'রেফতের স্তরের পার্থক্যহেতু মর্যাদাও বিভিন্ন। যাহোক, আয়াতের বক্তব্য খুবই স্পষ্ট। এতে মুসলমানদিগকে এই সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের পরিপূর্ণ আনুগত্যশীল অনুসারীগণ তাঁদেরই সাথে থাকবে যাঁরা অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। হে পরওয়ারদেগার! তুমি আমাদের সবাইকে তোমার এমনি ভালবাসা লাভের তওফীক দান কর। আমীন।

কতিপয় অতি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য ঃ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ আয়াতের প্রথমাংশে জেহাদের জন্য অস্ত্র সংগ্রহের এবং অতঃপর আয়াতের দ্বিতীয় অংশে জেহাদে অংশগ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে একটি বিষয় বোঝা যাচ্ছে এই যে, কোন ব্যাপারে বাহ্যিক উপকরণ অবলম্বন করা তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীলতার পরিপন্থী নয়। এ বিষয়টি আরও কয়েক জায়গায় সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ বোঝা যাচ্ছে, এখানে অস্ত্র সংগ্রহের নির্দেশ দেয়া হলেও এমন প্রতিশ্রুতি কিন্তু দেয়া হয়নি যে, এ অস্ত্রের কারণে তোমরা নিশ্চিতভাবেই নিরাপদ হতে পারবে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বাহ্যিক উপকরণ অবলম্বন করাটা মূলতঃ মানসিক স্বস্তিলাভের জন্যই হয়ে থাকে। বাস্তবে এগুলো লাভ-ক্ষতির ব্যাপারে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এরশাদ হয়েছে—

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا

অর্থাৎ, "হে নবী! আপনি বলে দিন, আমাদের উপর এমন কোন বিপদাপদই আসে না, যা আল্লাহ্ আমাদের তকদীর বা নিয়তিতে নির্ধারিত করে দেননি।"

১। এ আয়াতে প্রথমে জেহাদের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ অতঃপর জেহাদের উদ্দেশে রওয়ানা হওয়ার সুশৃংখল নিয়ম বাতলে দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে দু'টি বাক্য فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِانْفِرُوْا جَمِيْعًا ব্যবহার করা হয়েছে। ثبة শব্দটি ثُبَاتٍ এর বহুবচন। এর অর্থ ক্ষুদ্র দল। অর্থাৎ, তোমরা যখন জেহাদের উদ্দেশে রওয়ানা হবে, তখন একা একা বেরোবে না, বরং ছোট ছোট দলে বেরোবে কিংবা (সম্মিলিত) বড় সৈন্যদল নিয়ে বেরোবে। তার কারণ, একা একা যুদ্ধ করতে গেলে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। শত্রুরা এমন সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে মোটেই শৈথিল্য করে না।

উৎপীড়িতের সাহায্য করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয ঃ মক্কা নগরীতে এমন কিছু দুর্বল মুসলমান রয়ে গিয়েছিলেন, যারা দৈহিক দুর্বলতা এবং আর্থিক দৈন্যের কারণে হিজরত করতে পারছিলেন না। পরে কাফেররাও তাদেরকে হিজরত করতে বাধাদান করছিল এবং বিভিন্নভাবে নির্যাতন করতে আরম্ভ করেছিল, যাতে তারা ইসলাম ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এদের কারো কারো নামও তফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, হযরত ইবনে আব্বাস ও তাঁর মাতা, সালামা ইবনে হেশাম, ওলীদ ইবনে ওলীদ, আবু জান্‌দাল ইবনে সাহ্‌ল প্রমুখ।—(কুরতুবী) এসব সাহাবী নিজেদের ঈমানী বলিষ্ঠতার দরুন কাফেরদের অসহনীয়-উৎপীড়ন সহ্য করেও ঈমানের উপর স্থির থাকেন। অবশ্য তাঁরা এসব অত্যাচার উৎপীড়ন থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য বরাবরই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে মোনাজাত করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলা তাঁদের সে প্রার্থনা মঞ্জুর করে নেন এবং মুসলমানদিগকে নির্দেশ দেন, যাতে তাঁরা জেহাদের মাধ্যমে সেই নিপীড়িতদেরকে কাফেরদের অত্যাচার থেকে মুক্ত করেন।

এ আয়াতে বোঝা যায়, মুমিনরা আল্লাহ্ তাআলার দরবারে দু'টি বিষয়ের দোয়া করেছিলেন। একটি হলো এই যে, আমাদিগকে এই (মক্কা)

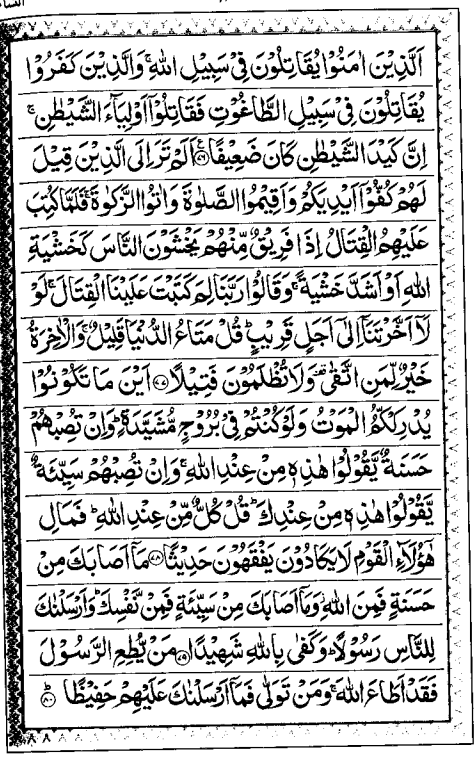

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا
يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ
اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ﴿٧٦﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ
لَهُمْ كُفُّوْٓا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ
عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ
اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْ
لَآ اَخَّرْتَنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ؕ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ۚ وَالْاٰخِرَةُ
خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى ۫ وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿٧٧﴾ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا
يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ؕ وَاِنْ تُصِبْهُمْ
حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ
يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ ؕ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ فَمَالِ
هٰٓؤُلَآءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا ﴿٧٨﴾ مَآ اَصَابَكَ مِنْ
حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ۫ وَمَآ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ ؕ وَاَرْسَلْنٰكَ
لِلنَّاسِ رَسُوْلًا ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿٧٩﴾ مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ
فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ﴿٨٠﴾

(৭৬) যারা ঈমানদার তারা যে জেহাদ করে আল্লাহ্‌র রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে শয়তানের পক্ষে। সুতরাং তোমরা জেহাদ করতে থাক শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে— (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল। (৭৭) তুমি কি সেসব লোককে দেখনি, যাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তোমরা নিজেদের হাতকে সংযত রাখ, নামায কায়েম কর এবং যাকাত দিতে থাক? অতঃপর যখন তাদের প্রতি জেহাদের নির্দেশ দেয়া হল, তৎক্ষণাৎ তাদের মধ্যে একদল লোক মানুষকে ভয় করতে আরম্ভ করল, যেমন করে ভয় করা হয় আল্লাহ্‌কে। এমন কি তার চেয়েও অধিক ভয়। আর বলতে লাগল, হায় পালনকর্তা, কেন আমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করলে! আমাদেরকে কেন আরও কিছুকাল অবকাশ দান করলে না। (হে রসুল,) তাদেরকে বলে দিন, পার্থিব ফায়দা সীমিত। আর আখেরাত পরহেযগারদের জন্য উত্তম। আর তোমাদের অধিকার একটি সূতা পরিমাণও খর্ব করা হবে না। (৭৮) তোমরা যেখানেই থাক না কেন; মৃত্যু কিন্তু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই— যদি তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের ভেতরেও অবস্থান কর, তবুও। বস্তুতঃ তাদের কোন কল্যাণ সাধিত হলে তারা বলে যে, এটা সাধিত হয়েছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। আর যদি তাদের কোন অকল্যাণ হয়, তবে বলে, এটা হয়েছে তোমার পক্ষ থেকে, বলে দাও, এসবই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। পক্ষান্তরে তাদের পরিণতি কি হবে, যারা কখনও কোন কথা বুঝতে চেষ্টা করে না। (৭৯) আপনার যে কল্যাণ হয়, তা হয় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, আর আপনার যে অকল্যাণ হয়, সেটা হয় আপনার নিজের কারণে। আর আমি আপনাকে পাঠিয়েছি মানুষের প্রতি আমার পয়গামের বাহক হিসাবে। আর আল্লাহ্ সব বিষয়েই যথেষ্ট— সব বিষয়ই তাঁর সম্মুখে উপস্থিত। (৮০) যে লোক রসূলের হুকুম মান্য করবে সে আল্লাহ্‌রই হুকুম মান্য করল। আর যে লোক বিমুখতা অবলম্বন করল, আমি আপনাকে (হে মুহাম্মদ), তাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠাইনি।

নগরী থেকে স্থানান্তরের ব্যবস্থা কর এবং দ্বিতীয়টি হলো যে, আমাদের জন্য কোন সহায় বা সাহায্যকারী পাঠাও। আল্লাহ্ তাঁদের দু'টি প্রার্থনাই কবুল করে নিয়েছিলেন। তা এভাবে যে, কিছু লোককে তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে যাবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন, যাতে তাদের প্রথম প্রার্থনাটি পূরণ হয়েছিল। অবশ্য কোন কোন লোক সেখানেই রয়ে যান এবং বিজয়ের পর রসূলে মকবুল (সাঃ) ইতাব ইবনে উসায়দ (রাঃ)-কে সেসব লোকের মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি এসব উৎপীড়িতদেরকে অত্যাচারীদের উৎপীড়ন-অত্যাচার থেকে মুক্ত করেন। আর এভাবেই পূর্ণ হয় তাদের দ্বিতীয় প্রার্থনাটি।

এ আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় জেহাদ করার নির্দেশ দানের পরিবর্তে وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ বাক্য ব্যবহার করার মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এমন পরিস্থিতিতে জেহাদ করাটাই স্বাভাবিক দায়িত্ব, যা না করা কোন ভালো মানুষের পক্ষে একান্তই অসম্ভব।

আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করা সর্ববিপদের অমোঘ প্রতিকার : يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا আয়াতে বলা হয়েছে যে, জেহাদের নির্দেশ দানের পেছনে একটি কারণ ছিল সে সমস্ত অসহায় দুর্বল নারী-পুরুষের প্রার্থনা। মুসলমানগণকে জেহাদ করার নির্দেশ দানের মাধ্যমে সে প্রার্থনা মঞ্জুরীর কথাই ঘোষণা হয়েছে। আর তাতে যথাশীঘ্র তাদের বিপদাপদ শেষ হয়ে যায়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় :

যুদ্ধক্ষেত্রে মুমিন ও কাফেরের উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা : اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা মুমিন বা ঈমানদার তারা জেহাদ করে আল্লাহ্‌র পথে। আর যারা কাফের তারা যুদ্ধ করে শয়তানের পথে। এতে পরিষ্কারভাবেই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র বিধান প্রতিষ্ঠা করাই মুখ্যতঃ মুমিনদের যাবতীয় চেষ্টা-চরিত্রের লক্ষ্য। কারণ, আল্লাহ্ই সমগ্র সৃষ্টির মালিক এবং তাঁর যাবতীয় বিধি-বিধান নির্ভেজাল ও ন্যায়ভিত্তিক। তাছাড়া ন্যায় ও কল্যাণভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলেই যথার্থ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। বিশ্বশান্তির জন্যও সমগ্র বিশ্বে এমন সংবিধানের প্রচলন অপরিহার্য, যাকে আল্লাহ্‌র কানুন বা সংবিধান বলা হয়। সুতরাং পরিপূর্ণ কোন মুমিন ব্যক্তি যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তখন তার সামনেই এ উদ্দেশ্য বিদ্যমান থাকে।

কিন্তু এর বিপরীতে যারা কাফের তাদের বাসনা থাকে কুফরের প্রচলন, কুফরের বিজয় এবং পৈশাচিক শক্তির শাসন প্রতিষ্ঠা করা, যাতে করে বিশ্বময় কুফরী ও শেরেকী বিস্তার লাভ করতে পারে। আর কুফরী ও শেরেকী যেহেতু শয়তানের পথ, সুতরাং কাফেররা শয়তানের কাজেই সাহায্য করে থাকে।

শয়তানের চক্রান্তের দুর্বলতা : اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا আয়াতে বলা হয়েছে যে, শয়তানের চক্রান্ত ও কলাকৌশল হয় দুর্বল। ফলে তা মুমিনের সামান্যতমও ক্ষতি করতে পারে না। অতএব, মুসলমানগণকে শয়তানের বন্ধুবর্গ অর্থাৎ, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে কোন রকম দ্বিধা করা উচিত নয়। তার কারণ, তাদের সাহায্যকারী হলেন আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং। পক্ষান্তরে শয়তানের কলাকৌশল কাফেরদের কিছুই মঙ্গল সাধন করবে না।

এ আয়াতে শয়তানের কলাকৌশলকে যে দুর্বল বলে অভিহিত করা হয়েছে, সেজন্য আয়াতের মাধ্যমেই দু'টি শর্তের বিষয়ও প্রতীয়মান হয়। (এক) যে লোকের বিরুদ্ধে শয়তান কলাকৌশল অবলম্বন করবে, তাকে মুসলমান হতে হবে এবং (দুই) সে যে কাজে নিয়োজিত থাকবে, তা একান্তভাবেই আল্লাহ্‌র জন্য হতে হবে ; কোন পার্থিব বস্তুর আকাঙ্ক্ষা কিংবা আত্মস্বার্থ প্রণোদিত হবে না। প্রথম শর্ত اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বাক্যের দ্বারা এবং দ্বিতীয় শর্ত يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ বাক্যের দ্বারা বোঝা যায়। এ দু'টি শর্তের যে কোন একটির অবর্তমানে শয়তানের কলাকৌশল দুর্বল হয়ে পড়া অবশ্যম্ভাবী নয়।

জেহাদের নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পর মুসলমানগণ কর্তৃক তা মুলতবীর আকাঙ্ক্ষার কারণ ঃ জেহাদের হুকুম অবতীর্ণ হবার পর মুসলমানদের পক্ষ থেকে তা স্থগিত থাকার বাসনা কোন আপত্তির কারণে ছিল না, বরং এটা ছিল একটি আনন্দমিশ্রিত অভিযোগ। তার কারণ, স্বভাবতঃ মানুষ যখন ব্যক্তিগতভাবে একা একা কোন চরম অসুবিধার সম্মুখীন হয়, তখন তার উত্তেজনা হঠাৎ উথলে উঠে এবং তখন কোন বিষয়ের প্রতিশোধ নেয়া তার পক্ষে সহজ হয়ে যায়। কিন্তু আরাম-আয়েশের সময়ে তাদের মন-মানস কোন যুদ্ধ-বিগ্রহে উদ্বুদ্ধ হতে চায় না। এটা হল মানুষের একটা সহজাত বৃত্তি। সুতরাং এসব মুসলমান যখন মক্কায় অবস্থান করছিলেন, তখন কাফেরদের অত্যাচার-উৎপীড়নে অসহ্য হয়ে তারা জেহাদের নির্দেশ কামনা করতেন। কিন্তু মদীনায় হিজরত করে চলে আসার পর যখন তারা শান্তি ও আরাম-আয়েশ লাভে সমর্থ হন, আর এমনি অবস্থায় যখন জেহাদের হুকুম অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের পুরাতন সে প্রতিশোধ স্পৃহা অনেকটা প্রশমিত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের মন-মস্তিষ্কে সেই উন্মাদনা ও উত্তেজনা বিদ্যমান ছিল না। সেজন্য তারা শুধু বাসনা করল যে, এক্ষণই যদি জেহাদের নির্দেশটি না আসত, তবেই ভাল হত। এই বাসনাকে আপত্তি হিসাবে দাঁড় করিয়ে সে সমস্ত মুসলমানকে পাপী সাব্যস্ত করা আদৌ সমীচীন নয়। মুসলমানগণ যদি উল্লেখিত অভিযোগটি মুখেই প্রকাশ করে থাকেন, তবে উল্লেখিত বক্তব্যটি প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু যদি অভিযোগটি মুখে প্রকাশ না করে থাকেন এবং তা শুধু মনে মনেই কল্পনাস্বরূপ এসে থাকে তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা অপরাধ বা পাপ বলে গণ্যই হয় না। এক্ষেত্রে উভয় অবস্থারই সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া আয়াতে উল্লেখিত قَالُوْا শব্দের দ্বারা এমন কোন সন্দেহ করা উচিত হবে না যে, তাঁরা মনের কল্পনাকে মুখেও প্রকাশ করেছিলেন। কারণ, এর অর্থ এমনও হতে পারে যে, তাঁরা হয়ত মনে মনেই বলে থাকবেন।-(বয়ানুল-কোরআন) কোন কোন তফসীরকারের মতে এ আয়াতের সম্পর্ক মুসলমানদের সাথে নয়, বরং মুনাফেকদের সাথে। সেক্ষেত্রে কোন প্রশ্নই থাকে না।— (তফসীরে - কবীর)

রাষ্ট্রশুদ্ধি অপেক্ষা আত্মশুদ্ধি অগ্রবর্তী ঃ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল্ আলামীন প্রথমে নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন, যা প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রশুদ্ধির উপকরণ। অর্থাৎ, এতে অত্যাচার—উৎপীড়নের প্রশমন করা যায়। এতেই প্রতিষ্ঠিত হয় সমগ্র দেশময় শান্তি ও শৃংখলা। এতে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষকে অপরের সংশোধন করার পূর্বে নিজের সংশোধন করা কর্তব্য। বস্তুতঃ মর্যাদার দিক দিয়েও প্রথম পর্যায়ের হুকুমটি হল ফরযে- আইন, আর দ্বিতীয় পর্যায়ের হুকুম হচ্ছে ফরযে-কেফায়াহ্। এতে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব ও অগ্রবর্তিতাই প্রতীয়মান হয়।— (মাযহারী)

দুনিয়া ও আখেরাতের নেয়ামতের পার্থক্য ঃ আয়াতে দুনিয়ার নেয়ামতের তুলনায় আখেরাতের নেয়ামতসমূহকে উত্তম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তার কয়েকটি কারণ রয়েছে। তা হল এই—

(১) দুনিয়ার নেয়ামত অল্প এবং আখেরাতের নেয়ামত অধিক।

(২) দুনিয়ার নেয়ামত অনিত্য এবং আখেরাতের নেয়ামত নিত্য-অফুরন্ত।

(৩) দুনিয়ার নেয়ামতসমূহের সাথে নানা রকম অস্থিরতাও রয়েছে, কিন্তু আখেরাতের নেয়ামত এ সমস্ত জঞ্জালমুক্ত।

(৪) দুনিয়ার নেয়ামত লাভ অনিশ্চিত, কিন্তু আখেরাতের নেয়ামত প্রত্যেক মুত্তাকী-পরহেযগার ব্যক্তির জন্য একান্ত নিশ্চিত।— (তফসীরে-কবীর)

পাকা ও সুদৃঢ় বাসস্থান নির্মাণ করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয় ঃ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা সুদৃঢ় প্রাসাদে হলেও মৃত্যু তোমাদেরকে বরণ করতেই হবে। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, বসবাস করার জন্য কিংবা ধন-সম্পদের হেফাযতের উদ্দেশে সুদৃঢ় ও উত্তম গৃহ নির্মাণ করা তাওয়াক্কুল বা ভরসার পরিপন্থী কিংবা শরীয়তবিরুদ্ধ নয়।— (কুরতুবী)

মানুষ শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র অনুগ্রহেই নেয়ামত লাভ করে ঃ مَآ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ এখানে حَسَنَةٍ (হাসানাতিন) -এর দ্বারা নেয়ামতকে বোঝানো হয়েছে।

এ আয়াতের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ যে সমস্ত নেয়ামত লাভ করে তা তাদের প্রাপ্য নয়, বরং একান্ত আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহেই প্রাপ্ত হয়। মানুষ যত এবাদত-বন্দেগীই করুক না কেন, তাতে সে কোন নেয়ামত লাভের অধিকারী হতে পারে না। কারণ, এবাদত করার যে সামর্থ্য, তাও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই লাভ হয়। তদুপরি আল্লাহ্ তাআলার অসংখ্য নেয়ামত তো রয়েছেই। এ সমস্ত নেয়ামত সীমিত এবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে কেমন করে লাভ করা সম্ভব? বিশেষ করে আমাদের এবাদত-বন্দেগী যদি আল্লাহ্ তাআলার শান মোতাবেক না হয়?

অতএব, মহানবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন—

"আল্লাহ্ তাআলার রহমত ব্যতীত কোন একটি লোকও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।' বলা হল, "আপনিও কি যেতে পারবেন না"? তিনি বললেন,"না আমিও না।" - (মাযহারী)

বিপদাপদ মানুষের কৃতকর্মের ফল ঃ এখানে وَمَآ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ -অর্থ হল বিপদাপদ। -(মাযহারী)

বিপদাপদ যদিও আল্লাহ্ তাআলাই সৃষ্টি করেন, কিন্তু তার কারণ হয় মানুষের কৃত অসৎকর্ম। মানুষটি যদি কাফের হয়ে থাকে, তবে তার উপর আপতিত বিপদাপদ তার জন্য সে সমস্ত আযাবের একটা সামান্য নমুনা হয়ে থাকে যা আখেরাতে তার জন্য নির্ধারিত রয়েছে। বস্তুতঃ আখেরাতের আযাব এর চাইতে বহুগুণ বেশী। আর যদি লোকটি ঈমানদার হয়, তবে তার উপর আপতিত বিপদাপদ হয় তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত, যা আখেরাতে

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ
مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ۖ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۖ فَأَعْرِضْ
عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٨١﴾ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ
الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا
كَثِيرًا ﴿٨٢﴾ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ
وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ
يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ
الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا
نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ
كَفَرُوا ۗ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ﴿٨٤﴾ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً
حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ
لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ﴿٨٥﴾ وَإِذَا حُيِّيتُم
بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ
كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٦﴾ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ
الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴿٨٧﴾

(৮১) আর তারা বলে, আপনার আনুগত্য করি। অতঃপর আপনার নিকট থেকে বেরিয়ে গেলেই তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ পরামর্শ করে রাতের বেলায় সে কথার পরিপন্থী যা তারা আপনার সাথে বলেছিল। আর আল্লাহ্ লিখে নেন, সে সব পরামর্শ যা তারা করে থাকে। সুতরাং আপনি তাদের ব্যাপারে নিস্পৃহতা অবলম্বন করুন এবং ভরসা করুন আল্লাহ্র উপর, আল্লাহ্ হলেন যথেষ্ট ও কার্যসম্পাদনকারী। (৮২) এরা কি লক্ষ্য করে না কোরআনের প্রতি? পক্ষান্তরে এটা যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কারও পক্ষ থেকে হত, তবে এতে অবশ্যই বহু বৈপরিত্য দেখতে পেত। (৮৩) আর যখন তাদের কাছে পৌঁছে কোন সংবাদ শান্তি-সংক্রান্ত কিংবা ভয়ের, তখন তারা সেগুলোকে রটিয়ে দেয়। আর যদি সেগুলো পৌঁছে দিত রসূল পর্যন্ত কিংবা তাদের শাসকদের পর্যন্ত, তখন অনুসন্ধান করে দেখা যেত সেসব বিষয়, যা তাতে রয়েছে অনুসন্ধান করার মত। বস্তুতঃ আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও করুণা যদি তোমাদের উপর বিদ্যমান না থাকত তবে তোমাদের অল্প কতিপয় লোক ব্যতীত সবাই শয়তানের অনুসরণ করতে শুরু করত! (৮৪) আল্লাহ্র রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন, আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের যিম্মাদার নন! আর আপনি মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করতে থাকুন। শীঘ্রই আল্লাহ্ কাফেরদের শক্তি-সামর্থ খর্ব করে দেবেন। আর আল্লাহ্ শক্তি-সামর্থের দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন শাস্তিদাতা। (৮৫) যে লোক সৎকাজের জন্য কোন সুপারিশ করবে, তা থেকে সেও একটি অংশ পাবে। আর যে লোক সুপারিশ করবে মন্দ কাজের জন্যে সে তার বোঝারও একটি অংশ পাবে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল। (৮৬) আর তোমাদেরকে যদি কেউ দোয়া করে, তাহলে তোমরাও তার জন্য দোয়া কর; তারচেয়ে উত্তম দোয়া অথবা তারই মত ফিরিয়ে বল। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে হিসাব-নিকাশ গ্রহণকারী। (৮৭) আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোনোই উপাস্য নেই। অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন কেয়ামতের দিন— এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তাছাড়া আল্লাহ্র চাইতে বেশী সত্য কথা আর কার হবে!

তার মুক্তির কারণ। অতএব, এক হাদীসে মহানবী (সাঃ) বলেছেন ঃ "কোন বিপদ এমন নেই, যা কোন মুসলমানের উপর পতিত হয়, অথচ তাতে আল্লাহ্ সে লোকের প্রায়শ্চিত্ত করে দেন না। এমন কি যে কাঁটাটি পায়ে ফোটে তাও।" — (মাযহারী)

"অপর এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে–হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, বান্দার উপর যে সমস্ত লঘু বা গুরু বিপদ আসে, সে সবই হয় তাদের পাপের ফলে। অথচ তাদের বহু পাপ ক্ষমাও করে দেয়া হয়। - (মাযহারী)

মহানবী (সাঃ)-এর নবুওয়ত সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যাপকঃ وَأَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (সাঃ)-কে সমগ্র মানবমণ্ডলীর জন্য রসূল বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। তিনি শুধু আরবদের জন্যই রসূল ছিলেন না, বরং তাঁর রেসালত ছিল সমগ্র বিশ্বমানবের জন্য ব্যাপক। তা তারা তখন উপস্থিত থাক অথবা না-ই থাক। কেয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত মানুষই এর আওতাভুক্ত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

নেতৃত্বদানকারীদের প্রতি বিশেষ হেদায়েত ঃ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا মুনাফেকরা যখন আপনার নিকট আসে, তখন বলে যে, আমরা আপনার নির্দেশ কবুল করে নিয়েছি। কিন্তু যখন তারা নাফরমানী করার উদ্দেশে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে, তখন রসূলে করীম (সাঃ) এর-বড় কষ্ট হয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা মহানবী (সাঃ)-কে হেদায়েত দান করেছেন যে, এসব বিষয়ে আপনি কোন পরোয়া করবেন না। আপনি আপনার যাবতীয় কাজ আল্লাহ্র উপর ভরসা করে চালিয়ে যেতে থাকুন। কারণ, আপনার জন্য তিনিই যথেষ্ট।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, যারা মানুষের নেতৃত্ব দান করতে যাবে, তাদেরকে নানা রকম জটিলতা অতিক্রম করতেই হবে। মানুষ তাদের প্রতি নানারকম উল্টা-সিধা অপবাদ আরোপ করবে। বন্ধুরূপী বহু শত্রুও থাকবে। এসব সত্ত্বেও সে নেতার পক্ষে সংকল্প ও দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে নিজের কাজে নিয়োজিত থাকা উচিত। যদি তার লক্ষ্য ও কর্মপন্থা সঠিক হয়, তবে ইনশাআল্লাহ কৃতকার্যতা অবশ্যই তার পদচুম্বন করবে।

কোরআনের উপর চিন্তা-গবেষণা ঃ اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা কোরআন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করার জন্য মানবকুলকে আহ্বান জানিয়েছেন। এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমতঃ এই যে, আল্লাহ্ তাআলা افلا يقرءون না বলে বলেছেন اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ এতে বাহ্যতঃ একটি সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে বলেই বোঝা যায়। তা'হল এই যে, এ আয়াতের দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, তারা যদি গভীর মনোযোগের সাথে কোরআনের প্রতি লক্ষ্য করে, তাহলে তারা এর অর্থ ও বিষয়বস্তুর মাঝে কোন পার্থক্য খুঁজে পাবে না। আর এ বিষয়টি একমাত্র চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। শুধুমাত্র তেলাওয়াত বা আবৃত্তির দ্বারা—যাতে তাদাব্বুর বা চিন্তা-গবেষণা অনুপস্থিত থাকবে- বহুবিধ বৈপরীত্য দেখা যাবে, যা বাস্তবের পরিপন্থী।

দ্বিতীয়তঃ এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, প্রতিটি মানুষ

কোরআনের উপর গভীর চিন্তা-গবেষণা করুক, এটাই হল কোরআনের চাহিদা। কাজেই কোরআন সম্পর্কিত চিন্তা-গবেষণা কিংবা তার পর্যালোচনা করা শুধুমাত্র ইমাম-মুজতাহিদগণেরই একক দায়িত্ব— এমন মনে করা যথার্থ নয়। জ্ঞান-বুদ্ধির পর্যায়ের মতই অবশ্য চিন্তা-গবেষণা এবং পর্যালোচনারও বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। ইমাম-মুজতাহিদগণের গবেষণা-পর্যালোচনা একটি আয়াত থেকে বহু বিষয় উদ্ভাবন করবে। ওলামা সম্প্রদায়ের চিন্তা-ভাবনা এসব বিষয় উপলব্ধি করবে। আর সাধারণ মানুষ যখন নিজের ভাষায় কোরআনের তরজমা-অনুবাদ পড়ে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে, তখন তাতে তাদের মনে সৃষ্টি হবে আল্লাহ্ তাআলার মহত্ত্বের ধারণা ও ভালবাসা। এটাই হল কৃতকার্যতার মূল চাবিকাঠি। অবশ্য জনসাধারণের জন্য ভুল বোঝাবুঝি ও বিভ্রান্তি থেকে অব্যাহতি লাভ করার জন্য পর্যায়ক্রমিকভাবে কোন বিজ্ঞ আলেমের নিকট কোরআন পাঠ করা উত্তম। আর তা সম্ভব না হলে কোন নির্ভরযোগ্য তফসীর অধ্যয়ন করবে এবং কোন জটিলতা বা সন্দেহ-সংশয় দেখা দিলে নিজের মনমতো তার কোন সমাধান করবে না, বরং বিজ্ঞ কোন আলেমের সাহায্য নেবে।

কোরআন ও সুন্নাহর তফসীরের কয়েকটি শর্ত ঃ উল্লেখিত আয়াতের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, কোরআন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা-পর্যালোচনা করার অধিকার প্রতিটি লোকেরই রয়েছে। কিন্তু আমরা বলেছি যে, চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা-পর্যালোচনার স্তরভেদ রয়েছে, সেমতে প্রত্যেক স্তরের হুকুমও পৃথক পৃথক। যে মুজতাহিদসুলভ গবেষণার দ্বারা কোরআনে হাকীমের ভেতর থেকে বিভিন্ন জটিল বিষয়ের মীমাংসাজনিত সিদ্ধান্ত বের করা হয়, তার জন্য তার লক্ষ্যসমূহ সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করে নেয়া অপরিহার্য, যাতে নির্ভুল মর্ম নির্ণয় করা সম্ভব হবে। পক্ষান্তরে যদি তার পটভূমিকা সংক্রান্ত জ্ঞান মোটেই না থাকে, কিংবা স্বল্প পরিমাণ থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, একজন মুজতাহিদের যেসব গুণ-বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন তা তার মধ্যে নেই। বলাবাহুল্য, তাহলে সে আয়াতের দ্বারা যেসব মর্ম উদ্ভাবন করবে, তাও হবে ভ্রান্ত। এমতাবস্থায় আলেম সম্প্রদায় যদি সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেন, তবে তা হবে একান্তই ন্যায়সঙ্গত।

যে লোক কোন দিন কোন মেডিক্যাল কলেজের ছায়াও মাড়ায়নি, সে যদি আপত্তি তুলে বসে যে, দেশের চিকিৎসা ক্ষেত্রে চিকিৎসা শাস্ত্রে সনদপ্রাপ্ত ডাক্তারদের একক আধিপত্য কেন দেয়া হল? একজন মানুষ হিসাবে আমারও সে অধিকার রয়েছে। কিংবা কোন নির্বোধ যদি বলতে শুরু করে যে, দেশে নদীনালা, পুল-নর্দমা প্রভৃতি সংস্কার ও নির্মাণের ঠিকাদার শুধুমাত্র বিজ্ঞ প্রকৌশলীদেরকেই কেন দেয়া হবে? আমিও তো একজন নাগরিক হিসাবে এ দায়িত্ব পালনের অধিকারী। অথবা বিকৃত-বুদ্ধি কোন লোক যদি এমন আপত্তি তুলতে আরম্ভ করে যে, দেশের সংবিধান বা আইন-কানুনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে শুধু আইনবিদদের একছত্র অধিকার হবে কেন? আমিও একজন বুদ্ধিমান নাগরিক হিসাবে একাজ সম্পাদন করতে পারি! তখন নিঃসন্দেহে এসব লোককে বলা হবে যে, দেশের নাগরিক হিসাবে অবশ্যই এসব কাজ সমাধা করার অধিকার তোমারও রয়েছে, কিন্তু এ সমস্ত কার্য সম্পাদনের যোগ্যতা অর্জন করতে গিয়ে যে বছরের পর বছর মাথা ঘামাতে হয়, সুবিজ্ঞ শিক্ষকদের নিকট এসব শাস্ত্র ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় এবং সে জন্য যেসব সনদ হাসিল করতে হয়, তোমরাও প্রথমে সে কষ্টটুকু স্বীকার করে আস। তাহলে সন্দেহাতীতভাবে তোমরাও এ সমস্ত কার্য সম্পাদনে সমর্থ হবে। কিন্তু এ কথাগুলোই যদি কোরআন ও সুন্নাহ্র ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মত সূক্ষ্ম ও জটিল কাজের বেলায় বলা হয়, তাহলে তখন আলেম সমাজের একচ্ছত্র আধিপত্যের বিরুদ্ধে শ্লোগান উত্থিত হয়। তাহলে কি সমগ্র বিশ্বে শুধুমাত্র কোরআন-সুন্নাহ্র জ্ঞানটিই এমন লা-ওয়ারিস রয়ে গেছে যে, এ ব্যাপারে যে কোন লোক নিজ নিজ ভঙ্গিতে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অধিকার সংরক্ষণ করবে! যদি সে লোক কোরআন-সুন্নাহ্র জ্ঞানার্জনে কয়েকটি মাসও ব্যয় না করে থাকে, তবুও কি?

কেয়াস একটি দলীল ঃ এ আয়াতের দ্বারা এ কথাও বোঝা যাচ্ছে যে, কোন মাসআলার বিশ্লেষণ যদি কোরআন ও সুন্নাহ্র মধ্যে সরাসরি না পাওয়া যায়, তাহলে তাতেই চিন্তা-ভাবনা করে তার সমাধান বের করার চেষ্টা করা কর্তব্য। আর একেই শরীয়তের পরিভাষায় 'কেয়াস' বলা হয়।

বহু মতবিরোধ ও তার ব্যাখ্যা ঃ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا এ আয়াতে উল্লেখিত اختلاف كثير (বা বহু মতবিরোধ) এর মর্ম এই যে, যদি কোন একটি বিষয়ে মতবিরোধ একটি হয়, তবে বহু বিষয়ে মতবিরোধও বহু হয়ে থাকে। – (বয়ানুল-কোরআন) কিন্তু এখানে (অর্থাৎ, কোরআনে) কোন একটি বিষয়েও কোন মতবিরোধ বা মতপার্থক্য নেই। অতএব, এটা একান্তভাবেই আল্লাহ্র কালাম। মানুষের কালামে এমন অপূর্ব সামঞ্জস্য হতেই পারে না। এর কোথাও না আছে ভাষালঙ্কারের কোন ত্রুটি, না আছে তওহীদ, কুফর, কিংবা হারাম-হালালের বিবরণে কোন স্ববিরোধিতা ও পার্থক্য। তাছাড়া গায়বী বিষয়সমূহের মাঝেও এমন কোন সংবাদ নেই, যা প্রকৃত বিষয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তদুপরি না আছে কোরআনের ধারাবাহিকতার কোন পার্থক্য যে, একটি হবে অলঙ্কারপূর্ণ আরেকটি হবে অলঙ্কারহীন। প্রত্যেক মানুষের ভাষ্য-বিবৃতি ও রচনা-সঙ্কলনে পরিবেশের কম-বেশী প্রভাব অবশ্যই থাকে— আনন্দের সময় তা এক ধরনের হয়, আবার বিষাদে হয় অন্য রকম। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে হয় এক রকম, আবার অশান্তিপূর্ণ পরিবেশে অন্য রকম। কিন্তু কোরআন এ ধরনের যাবতীয় ত্রুটি, পার্থক্য ও স্ববিরোধিতা থেকে পবিত্র ও উর্ধ্বে। আর এটাই হল কালামে-এলাহী হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

যাচাই না করে কোন কথা রটনা করা মহাপাপ ঃ এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, কোন শোনা কথা যাচাই, অনুসন্ধান ব্যতিরেকে বর্ণনা করা উচিত নয়। রসূলে করীম (সাঃ)-এর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "কোন লোকের পক্ষে মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে কোন রকম যাচাই না করেই সমস্ত শোনা কথা প্রচার করে।"

অপর এক হাদীসে তিনি বলেছেন ঃ "যে লোক এমন কোন কথা বর্ণনা করে, যার ব্যাপারে সে জানে যে, সেটি মিথ্যা, তাহলে সে দু'জন মিথ্যাবাদীর একজন মিথ্যাবাদী – (ইবনে – কাসীর)

উলুল-আমর কারা ঃ وَلَوْ رَدُّوْهُ إِلَى الرَّسُوْلِ وَإِلٰى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ -আয়াতে উল্লেখিত استنباط শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে কূপের গভীরতা থেকে পানি তোলা। সে জন্যই কূপ খননকালে প্রথম যে পানি বেরোয় তাকে আরবীতে ماء مستنبط বলা হয়। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হল কোন বিষয়ের গভীরে গিয়ে তার প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। – (কুরতুবী)

'উলুল-আমর' বা দায়িত্বশীল লোক নির্ণয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে।

হযরত হাসান, কাতাদা ও ইবনে আবী লায়লা (রহঃ) প্রমুখের মতে দায়িত্বশীল লোক বলতে ওলামা ও ফকীহগণকে বোঝায়। হযরত সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা শাসনকর্তা ও কর্তৃপক্ষকে বোঝায়। আল্লামা আবু বকর জাসসাস এতদুভয় মত উদ্ধৃত করার পর বলেছেন, সঠিক ব্যাপার হলো এই যে, এতদুভয় অর্থই ঠিক। কারণ, 'উলুল-আমর' শব্দটি উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অবশ্য এতে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন যে, 'উলুল-আমর' বলতে ফকীহগণকে বোঝানো যেতে পারে না। তার কারণ, اولوا الامر (উলুল-আমর) শব্দটি তার শাব্দিক অর্থের দিক দিয়ে সে সমস্ত লোককে বোঝায়, যাদের হুকুম বা নির্দেশ চলতে পারে। বলাবাহুল্য, এ কাজটি ফকীহ্গণের নয়। প্রকৃত বিষয় হল এই যে, হুকুম চলার দু'টি প্রেক্ষিত রয়েছে। (এক) জবরদস্তিমূলক। এটা শুধুমাত্র শাসকগোষ্ঠী বা সরকার দ্বারাই সম্ভব হতে পারে। (দুই) বিশ্বাস ও আস্থার দরুন হুকুম মান্য করা। আর সেটা ফকীহ্গণই অর্জন করতে পেরেছিলেন এবং যা সর্বযুগের মুসলমানদের অবস্থার দ্বারা প্রতিভাত হয়। ধর্মীয় ব্যাপারে সাধারণ মুসলমানগণ নিজের ইচ্ছা ও মতামতের তুলনায় আলেম সম্প্রদায়ের নির্দেশকে অবশ্য পালনীয় বলে সাব্যস্ত করে থাকে। তাছাড়া শরীয়তের দৃষ্টিতেও সাধারণ মানুষের জন্য আলেমদের হুকুম মান্য করা ওয়াজেবও বটে। সুতরাং তাঁদের ক্ষেত্রেও 'উলুল আমর'-এর প্রয়োগ যথার্থ হবে।- (আহকামুল কোরআন, জাসসাস)।

আধুনিক সমস্যাবলী সম্পর্কিত বিষয়ে কেয়াস ও ইজ্‌তেহাদ ঃ এ আয়াতের দ্বারা একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, যেসব বিষয়ে কোন 'নস' তথা কোরআন-হাদীসের সরাসরি কোন বিধান নেই, সেগুলোর হুকুম 'ইজতেহাদ' ও কেয়াসের রীতি অনুযায়ী কোরআনের আয়াত থেকে উদ্ভাবন করতে হবে। তার কারণ, এ আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আধুনিক কোন বিষয়ের সমাধানকল্পে রসূলে করীম (সাঃ)-এর বর্তমানে তাঁর নিকট যাও। আর যদি তিনি বর্তমান না থাকেন, তাহলে ফকীহ্গণের নিকট যাও। কারণ, তাঁদেরই মধ্যে বিধান উদ্ভাবন করার মত পরিপূর্ণ যোগ্যতা বিদ্যমান রয়েছে।

এই বর্ণনার দ্বারা কতিপয় বিষয় প্রতীয়মান হয়। যথা, 'নস' বা কোরআন-হাদীসের সরাসরি নির্দেশের অবর্তমানে ওলামাদের কাছে যেতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্‌র নির্দেশ দু'রকম। কিছু হল সরাসরি 'নস' বা কোরআন-সুন্নাহ্‌ভিত্তিক এবং কিছু হল পরোক্ষ ও অস্পষ্ট, যা আল্লাহ্ তাআলা আয়াতসমূহের গভীরে নিহিত রেখেছেন।

তৃতীয়তঃ এ ধরনের অন্তর্নিহিত মর্মগুলো কেয়াস ও ইজতেহাদের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা আলেম সম্প্রদায়ের একান্ত দায়িত্ব।

চতুর্থতঃ এসব বিধানের ক্ষেত্রে আলেম সম্প্রদায়ের অনুসরণ করা সাধারণ মানুষের অবশ্য কর্তব্য। - (আহ্‌কামুল-কোরআন, জাসসাস)

রসূলে করীম (সাঃ)-ও প্রমাণ উদ্ভাবন সংক্রান্ত নির্দেশের আওতাভুক্তঃ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রসূলে করীম (সাঃ)-ও দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে হুকুম-আহকাম উদ্ভাবনের দায়িত্বপ্রাপ্ত। তার কারণ, আয়াতে দু'রকম লোকের নিকট প্রত্যাবর্তন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাদের একজন হলেন রসূলে-আকরাম (সাঃ) এবং অপরজন হচ্ছেন 'উলুম-আমর'। অতঃপর বলা হয়েছে لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ —আর এই নির্দেশটি হল ব্যাপক। এতে উল্লেখিত দু'রকম লোকের মধ্যে কাকেও নির্দিষ্ট করা হয়নি। অতএব, এতে প্রমাণিত হয় যে, হুযুর (সাঃ) নিজেও আহ্‌কাম উদ্ভাবন-সংক্রান্ত নির্দেশের আওতাভুক্ত।— (আহ্‌কামুল -কোরআন, জাসসাস)

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ (১) কারো মনে যদি এমন কোন সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, এ আয়াতের দ্বারা শুধুমাত্র এতটুকুই বোঝা যায় যে, শত্রুর ভয়-শঙ্কা সম্পর্কে তোমরা নিজে নিজে কোন রটনা করো না, বরং যারা জ্ঞানী ব্যক্তি এবং যারা সমাজের নেতৃস্থানীয় তাদের সাথে যোগাযোগ কর। তারা চিন্তা-ভাবনা করে যা করতে বলবেন তোমরা সে মতই কাজ করবে। বলাবাহুল্য, দুর্যোগ সংক্রান্ত বিষয়ের সাথে এর কোন সম্পর্কই নেই।

তাহলে তার উত্তর এই যে, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ বাক্যে শত্রুর কোন উল্লেখ নেই। কাজেই এ নির্দেশ ভয় ও শান্তি উভয় অবস্থাতেই ব্যাপক। এ নির্দেশের সম্পর্ক যেমন শত্রুর সাথে, তেমনিভাবে দুর্যোগ সংক্রান্ত সমস্যার সাথেও বটে। কারণ, যখন কোন নতুন বিষয় বা মাসআলা সাধারণ মানুষের সামনে উদ্ভব হয়, যার হালাল হওয়া কিংবা হারাম হওয়ার ব্যাপারে সরাসরি কোরআন বা হাদীসের কোন নির্দেশ নেই, তখন তারা বিরাট দুশ্চিন্তার সম্মুখীন হয়ে পড়ে। তারা বুঝে উঠতে পারে না, কোন দিকটি তারা গ্রহণ করবে। অথচ উভয় দিকেই লাভ-ক্ষতি উভয় সম্ভাবনাই রয়েছে। এমন অবস্থায় শরীয়ত সবচেয়ে উত্তম পথ বাতলে দিয়েছে। তাহল উদ্ভাবন (استنباط) কর। উদ্ভাবনের মাধ্যমে যা পাওয়া যায়, তারই উপর আমল করবে। - (আহকামুল-কোরআন, জাসসাস)

ইজতেহাদ ও এস্তেম্বাত বলিষ্ঠ ধারণা সৃষ্টি করে, নিশ্চিত বিশ্বাস নয় ঃ (২) এস্তেম্বাত এর মাধ্যমে আলেমগণ যে নির্দেশ উদ্ভাবন করবেন, সে সম্পর্কে নিশ্চিত ও অকাট্যভাবে একথা বলা যাবে না যে, আল্লাহ্ তাআলার নিকটও এটাই নিশ্চিতভাবে সত্য ও সঠিক। বরং এই নির্দেশ বা বিধানটি সম্পূর্ণভাবে অভ্রান্ত নাও হতে পারে। তবে তা সঠিক হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল হয়ে থাকে, যা আমল করার জন্য যথেষ্ট।- (আহকামুল - কোরআন, জাসসাস)

কোরআনী বিধানের বর্ণনাশৈলী ঃ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ — এ আয়াতের প্রথম বাক্যে রসূলে করীম (সাঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, "আপনি একাই যুদ্ধের জন্যে তৈরী হয়ে পড়ুন; কেউ আপনার সাথে থাক বা নাই থাক।" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বাক্যে একথাও বলা হয়েছে যে, অন্যান্য মুসলমানদেরকে এ ব্যাপারে উৎসাহদানের কাজটিও পরিহার করবেন না। এভাবে উৎসাহদানের পরেও যদি তারা যুদ্ধের জন্য উদ্‌বুদ্ধ না হয়, তবে আপনার দায়িত্ব পালিত হয়ে গেল; তাদের কর্মের জন্য আপনাকে জবাবদেহী করতে হবে না।

এতদসঙ্গে একা যুদ্ধ করতে গিয়ে যেসব বিপদাশঙ্কা দেখা দিতে পারে, তার প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে— "আশা করা যায় আল্লাহ্ কাফেরদের যুদ্ধ বন্ধ করে দেবেন এবং তাদেরকে ভীত ও পরাজিত করে দেবেন। আর আপনাকে একাই জয়ী করবেন।" অতঃপর এই বিজয় প্রসঙ্গে প্রমাণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, আপনার প্রতি যখন আল্লাহ্ তাআলার সমর্থন রয়েছে, যার সমরশক্তি কাফেরদের শক্তি অপেক্ষা অসংখ্যগুণ বেশী, তখন আপনার বিজয়ই অবশ্যম্ভাবী ও নিশ্চিত। তারপর এই সুদৃঢ় প্রতিরোধ ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় শাস্তির কঠোরতা বর্ণনা করা হয়েছে। এ

শাস্তি কেয়ামতের দিনেই হোক, কিংবা পার্থিব জীবনেই হোক, যুদ্ধের ক্ষেত্রে যেমন আমার শক্তি অপরাজেয়, তেমনি শাস্তি দানের ক্ষেত্রেও আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।

সুপারিশের স্বরূপ , বিধি ও প্রকারভেদ ঃ مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً —এ আয়াতে শাফাআত অর্থাৎ, সুপারিশকে ভাল ও মন্দ দু'ভাগে বিভক্ত করার পর এর স্বরূপ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক সুপারিশ যেমন মন্দ নয়, তেমনি প্রত্যেক সুপারিশ ভালও নয়। আরও বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ভাল সুপারিশ করবে, সে সওয়াবের অংশ পাবে এবং যে ব্যক্তি মন্দ সুপারিশ করবে, সে আযাবের অংশ পাবে। আয়াতে ভাল সুপারিশের সাথে نصيب শব্দ এবং মন্দ সুপারিশের সাথে كفل শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অভিধানে উভয় শব্দের অর্থই এক। অর্থাৎ, কোন কিছুর অংশবিশেষ। কিন্তু সাধারণ পরিভাষায় نصيب শব্দটি ভাল অংশ এবং كفل শব্দটি মন্দ অংশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, যদিও কখনও ভাল অংশেও ব্যবহৃত হয়। যেমন, কোরআন পাকে يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ (তাঁর রহমতের দু'টি অংশ) ব্যবহার করা হয়েছে।

شفاعة –এর শাব্দিক অর্থ মিলিত হওয়া বা মিলিত করা। এ কারণেই আরবী ভাষায় شفعة শব্দ জোড় অর্থে এবং বিপরীতে وتر শব্দ বিজোড় অর্থে ব্যবহার করা হয়। অতএব, شفاعة –এর শাব্দিক অর্থ এই দাঁড়ায় যে, কোন দুর্বল অধিকার প্রার্থীর সাথে স্বীয় শক্তি যুক্ত করে তাকে দেয়া কিংবা অসহায় একা ব্যক্তির সাথে নিজে মিলিত হয়ে তাকে জোড় করে দেয়া।

এতে জানা গেল যে, বৈধ শাফাআত ও সুপারিশের একটি শর্ত এই যে, যার পক্ষে সুপারিশ করা হবে, তার দাবী সত্য ও বৈধ হতে হবে এবং অপর শর্ত এই যে, দুর্বলতার কারণে সে স্বীয় দাবী প্রবলদের কাছে স্বয়ং উত্থাপন করতে পারবে না। এতে বোঝা গেল যে, অসত্য সুপারিশ করা অথবা অপরকে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করা হচ্ছে মন্দ সুপারিশ। নিজ সম্পর্কে ব্যবহার করলে কিংবা প্রভাব-প্রতিপত্তিজনিত চাপ ও জবরদস্তি প্রয়োগ করা হলে জুলুম হওয়ার কারণে তাও অবৈধ। কাজেই এরূপ সুপারিশও মন্দ সুপারিশেরই অন্তর্ভুক্ত।

এখন আলোচ্য আয়াতের সারবস্তু এই যে, যে ব্যক্তি কারো বৈধ অধিকার ও বৈধ কাজের জন্যে বৈধ পন্থায় সুপারিশ করবে, সেও সওয়াবের অংশ পাবে। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি কোন অবৈধ কাজের জন্যে অথবা অবৈধ পন্থায় সুপারিশ করবে, সে আযাবের অংশ পাবে।

অংশ পাওয়ার অর্থ এই যে, যার কাছে সুপারিশ করা হয়, সে যখন এ উৎপীড়িতের কিংবা বঞ্চিতের কার্যোদ্ধার করে দেবে, তখন কার্যোদ্ধারকারী ব্যক্তি যেমন সওয়াব পাবে, তেমনি সুপারিশকারীও সওয়াব পাবে।

এমনিভাবে কোন অবৈধ কাজের সুপারিশকারীও গোনাহ্গার হবে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সুপারিশকারীর সওয়াব কিংবা আযাব তার সুপারিশ কার্যকরী ও সফল হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়; বরং সর্বাবস্থায় সে নিজ অংশ পাবে।

রসূলে-করীম (সাঃ) বলেন ঃ "যে, ব্যক্তি কোন সৎকাজে অপরকে উদ্বুদ্ধ করে, সেও ততটুকু সওয়াব পায়, যতটুকু সৎকর্মী পায়।" –(মাযহারী)

ইবনে মাজায় হযরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ 'যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে হত্যার কাজে একটি বাক্য দ্বারাও সাহায্য করে, তাকে কেয়ামতে আল্লাহ্ তাআলার সামনে উপস্থিত করা হবে এবং তার কপালে লিখিত থাকবে ঃ "এ ব্যক্তি আল্লাহ্র অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত ও নিরাশ।" (মাযহারী)

এতে জানা গেল যে, সৎকাজে কাউকে উদ্বুদ্ধ করা যেমন একটি সৎকাজ তেমনি অসৎ ও পাপ কাজে কাউকে উদ্বুদ্ধ করা কিংবা সহযোগিতা প্রদান করা সমান গোনাহ্।

আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছেঃ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا আভিধানিক দিক দিয়ে مقيت শব্দের অর্থ তিনটি ঃ (এক) শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান, (দুই) উপস্থিত ও দর্শক এবং (তিন) রুযী বন্টনকারী। উল্লেখিত বাক্যে তিনটি অর্থই প্রযোজ্য। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে বাক্যের অর্থ হবে— আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। যে কাজ করে এবং যে সুপারিশ করে তাদেরকে প্রতিদান কিংবা শাস্তিদান তাঁর পক্ষে কঠিন নয়।

দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে বাক্যের উদ্দেশ্য হবে— আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক বস্তুর পরিদর্শক ও প্রত্যেক বস্তুর সামনে উপস্থিত। কে কোন্ নিয়তে সুপারিশ করে; আল্লাহ্র ওয়াস্তে মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যার্থে করে, না ঘুষ হিসেবে তার কাছ থেকে কোন মতলব হাসিলের উদ্দেশে করে, তিনি সে সবই জানেন।

তৃতীয় অর্থের দিক দিয়ে বাক্যের মর্ম হবে রিযিক ও রুযী বন্টনের কাজে আল্লাহ্ স্বয়ং যিম্মাদার। যার জন্যে যতটুকু লিখে দিয়েছেন, সে ততটুকু অবশ্যই পাবে। কারো সুপারিশে তিনি প্রভাবিত হবেন না; বরং যাকে যতটুকু ইচ্ছা দেবেন। তবে সুপারিশকারী ব্যক্তি মাঝখান থেকে সওয়াব পেয়ে যাবে। কেননা, এটা হচ্ছে দুর্বলের সাহায্য।

হাদীসে বলা হয়েছে ঃ "আল্লাহ্ তাআলা ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার সাহায্য অব্যাহত রাখেন, যতক্ষণ সে কোন মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যে ব্যাপৃত থাকে। তোমরা সুপারিশ কর, সওয়াব পাবে। অতঃপর আল্লাহ্ স্বীয় পয়গম্বরের মাধ্যমে যে ফয়সালা করেন তাতে সন্তুষ্ট থাক।'

এ কারণেই কোরআন পাকের ভাষায় ইঙ্গিত রয়েছে যে, সুপারিশের সওয়াব ও আযাব সুপারিশ সফল হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়, বরং সুপারিশ করলেই সর্বাবস্থায় সওয়াব অথবা আযাব হবে। আপনি ভাল সুপারিশ করলেই সওয়াবের অধিকারী হয়ে যাবেন এবং মন্দ সুপারিশ করলেই আযাবের যোগ্য হয়ে পড়বেন— আপনার সুপারিশ কার্যকরী হোক বা না হোক।

তফসীর বাহ্রে মুহীত, বয়ানুল-কোরআন প্রভৃতি গ্রন্থে من يشفع বাক্যে منها শব্দটিকে سبب সাব্যস্ত করে এদিকে ইঙ্গিত করে বলে বলা হয়েছে। তফসীরে মাযহারীতে তফসীরবিদ মুজাহিদের উক্তি বর্ণনা করা হয়েছে যে, সুপারিশকারী সুপারিশের সওয়াব পাবে, যদি তার সুপারিশ গ্রহণ করা নাও হয়। এ বিষয়টি শুধু রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং অন্যের কাছে সুপারিশ করেই সুপারিশকারী যেন ক্ষান্ত হয়ে যায়, তা গ্রহণ করতে বাধ্য করবে না। স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার মুক্ত করা বাঁদী বরীরা স্বীয় স্বামী মুগীছের কাছ থেকে তালাক নিয়েছিলেন। তালাক দেয়ার পর মুগীছ

বরীরার ভালবাসায় পাগলপারা হয়ে পড়লে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুগীছকে পুনরায় বিবাহ করার জন্য বরীরার কাছে সুপারিশ করেন। বরীরা আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! এটি আপনার নির্দেশ হলে শিরোধার্য, পক্ষান্তরে সুপারিশ হলে আমার মন তাতে সম্মত নয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ নির্দেশ নয়, সুপারিশই। বরীরা জানতেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নীতির বাইরে অসন্তুষ্ট হবেন না। তাই পরিষ্কার ভাষায় আরয করলেন ঃ তাহলে আমি এ সুপারিশ গ্রহণ করব না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হৃষ্টচিত্তে তাকে তদবস্থায়ই থাকতে দিলেন।

এ ছিল সুপারিশের স্বরূপ। শরীয়তের দৃষ্টিকোণে এ জাতীয় সুপারিশ দ্বারাই সওয়াব পাওয়া যায়। আজকাল বিকৃত আকারের যে সুপারিশ মানুষের মধ্যে প্রচলিত আছে, তা প্রকৃতপক্ষে সুপারিশ নয়; বরং এ হচ্ছে সম্পর্ক ও প্রভাব-প্রতিপত্তির মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করা। এ কারণেই আজকাল সুপারিশ গ্রহণ করা না হলে সুপারিশকারী অসন্তুষ্ট হয়ে যায়; বরং শত্রুতা সাধনে উদ্যত হয়। অথচ বিবেক ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে চাপ সৃষ্টি করা জবরদস্তির অন্তর্ভুক্ত এবং কঠোর গোনাহ। এটি কারও অর্থ সম্পদ কিংবা কারও অধিকার জবরদস্তি করায়ত্ত করে নেয়ার মতই। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি শরীয়ত ও আইনের দৃষ্টিতে স্বাধীন ছিল। আপনি জোর-জবরদস্তি করে তার স্বাধীনতা হরণ করেন। সুতরাং এ হচ্ছে একজনের অভাব দূর করার জন্যে অন্যের ধন-সম্পদ চুরি করে বিলিয়ে দেয়ার অনুরূপ। সুপারিশের বিনিময় গ্রহণ করা ঘুষ। হাদীসে একে سحت বা হারাম বলা হয়েছে। আর্থিক ঘুষ হোক কিংবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শ্রমের বিনিময়ে নিজের কোন কাজ হাসিল করা হোক— সর্বপ্রকার ঘুষই এর অন্তর্ভুক্ত।

কাশ্‌শাফ প্রভৃতি গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ ঐ সুপারিশ ভাল, যার উদ্দেশ্য কোন মুসলমানের অধিকার পূর্ণ করা অথবা তার কোন বৈধ উপকার করা অথবা ক্ষতির কবল থেকে তাকে রক্ষা করা হয়ে থাকে। এছাড়া এ সুপারিশটিও কোন জাগতিক লাভালাভ অর্জনের জন্যে না হওয়া চাই ; বরং আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দুর্বলের সমর্থনের লক্ষ্যে হওয়া উচিত এবং সুপারিশ করে কোন আর্থিক অথবা কায়িক ঘুষ না নেয়া চাই। এ সুপারিশ কোন অবৈধ কাজে না হওয়া চাই এবং যে অপরাধের শাস্তি কোরআনে নির্ধারিত রয়েছে, এরূপ কোন অপরাধ মাফ করাবার জন্যেও না হওয়া চাই।

বাহরে মুহীত, মাযহারী প্রভৃতি গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ কোন মুসলমানের অভাব-অনটন দূর করার জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করাও ভাল সুপারিশের অন্তর্ভুক্ত। এতে দোয়াকারীও সওয়াব পায়। এক হাদীসে আছে, যখন কেউ মুসলমান ভাইয়ের জন্যে নেক দোয়া করে, তখন ফেরেশতা বলেন ঃ ولك بمثل অর্থাৎ, আল্লাহ্, তাআলা তোমারও অভাব দূর করুন।

সালাম ও ইসলাম ঃ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا – এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা সালাম ও তার জওয়াবের আদব বর্ণনা করেছেন।

تحية – এর শব্দের ব্যাখ্যা ও এর ঐতিহাসিক পটভূমি ঃ শাব্দিক অর্থ حياك الله (আল্লাহ্ তোমাকে জীবিত রাখুন) বলা। ইসলামপূর্ব কালে আরবরা পরস্পরের সাক্ষাৎকালে একে অন্যকে حياك الله কিংবা انعم الله بك عينا কিংবা انعم صباحا ইত্যাদি সম্ভাষণে সালাম করত। ইসলাম এ সালাম পদ্ধতি পরিবর্তন করে السلام عليكم বলার রীতি প্রচলিত করেছে। এর অর্থ, তুমি সর্বপ্রকার কষ্ট ও বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাক।

ইবনে-আরাবী আহকামুল-কোরআন গ্রন্থে বলেন ঃ 'সালাম' শব্দটি আল্লাহ্ তাআলার উত্তম নামসমূহের অন্যতম। السلام عليكم – এর অর্থ এই যে, رقيب عليكم অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের সংরক্ষক।

ইসলামী সালাম অন্যান্য জাতির সালাম থেকে উত্তম ঃ জগতের প্রত্যেক সভ্য জাতির মধ্যে পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাতের সময় ভালবাসা ও সম্প্রীতি প্রকাশার্থ কোন না কোন বাক্য আদান-প্রদান করার প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু তুলনা করলে দেখা যাবে যে, ইসলামী সালাম যতটুকু ব্যাপক অর্থবোধক, অন্য কোন সালাম ততটুক নয়। কেননা, এতে শুধু ভালবাসাই প্রকাশ করা হয় না, বরং সাথে সাথে ভালবাসার যথার্থ হকও আদায় করা হয়। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করা হয় যে, আল্লাহ্ আপনাকে সর্ববিধ বিপদাপদ থেকে নিরাপদে রাখুন। এ দোয়াটি আরবদের প্রথা অনুযায়ী শুধু জীবিত থাকার দোয়া নয়; বরং পবিত্র জীবনের দোয়া। অর্থাৎ, সর্ববিধ বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া। এতে এ বিষয়েরও অভিব্যক্তি রয়েছে যে, আমরা ও তোমরা- সবাই আল্লাহ্ তাআলার মুখাপেক্ষী। তাঁর অনুমতি ছাড়া আমরা একে অপরের উপকার করতে পারি না। এ অর্থের দিক দিয়ে বাক্যটি একাধারে একটি এবাদত এবং মুসলমান ভাইকে আল্লাহ্‌র কথা মনে করিয়ে দেয়ার উপায়ও বটে।

ইবনে আরাবী আহ্‌কামুল-কোরআন গ্রন্থে ইমাম ইবনে উয়াইনার এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন ঃ

السلام يقول انت امن منى – اتدرى ما অর্থাৎ, সালাম কি বস্তু, তুমি জান? সালামকারী ব্যক্তি বলে যে, তুমি আমার পক্ষ থেকে বিপদমুক্ত।

মোটকথা এই যে, ইসলামী সালামে বিরাট অর্থগত ব্যাপ্তি রয়েছে। যথা,

(১) এতে রয়েছে আল্লাহ্ তাআলার যিক্‌র, (২) আল্লাহ্‌র কথা মনে করিয়ে দেয়া, (৩) মুসলমান ভাইয়ের প্রতি ভালবাসা ও সম্প্রীতি প্রকাশ, (৪) মুসলমান ভাইয়ের জন্য সর্বোত্তম দোয়া এবং (৫) মুসলমান ভাইয়ের সাথে এ চুক্তি যে, আমার হাত ও মুখ দ্বারা আপনার কোন কষ্ট হবে না। সহীহ্ হাদীসে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলেন ঃ "যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্য মুসলমানরা নিরাপদ সে-ই প্রকৃত মুসলমান।"

আয়াতে বিষয়বস্তুর উপসংহারে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

"আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক বস্তুর হিসাব নিবেন।" মানুষ এবং ইসলামী অধিকার; যথা সালাম ও সালামের জওয়াব ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তাআলা এগুলোরও হিসাব নিবেন। এরপর বলা হয়েছে ঃ

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ –অর্থাৎ, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তাকেই উপাস্য মনে কর এবং যে কাজই কর, তাঁর এবাদতের নিয়তে কর। তিনি কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে একত্রিত করবেন। এতে কোন সন্দেহ নেই। ঐ দিন সবাইকে প্রতিদান দেবেন। কেয়ামতের ওয়াদা, প্রতিদান ও শাস্তির সংবাদ সব সত্য। وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا – কেননা, এ সংবাদ আল্লাহ্‌র দেয়া। আল্লাহ্‌র চাইতে অধিক কার কথা সত্য হতে পারে?

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا
اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ
فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ﴿٨٨﴾ وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا
فَتَكُوْنُوْنَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَآءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ
وَجَدْتُّمُوْهُمْ ۪ وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿٨٩﴾ اِلَّا
الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ اَوْ
جَآءُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ اَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوْا
قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقٰتَلُوْكُمْ ۚ فَاِنِ
اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَاَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ ۙ فَمَا
جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا ﴿٩٠﴾ سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ
يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّاْمَنُوْكُمْ وَيَاْمَنُوْا قَوْمَهُمْ ۚ كُلَّمَا رُدُّوْٓا اِلَى
الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا ۚ فَاِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ وَيُلْقُوْٓا اِلَيْكُمُ
السَّلَمَ وَيَكُفُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ
ثَقِفْتُمُوْهُمْ ۚ وَاُولٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿٩١﴾

(৮৮) অতঃপর তোমাদের কি হল যে, মুনাফিকদের সম্পর্কে তোমরা দু' দল হয়ে গেলে? অথচ আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন তাদের মন্দ কাজের কারণে। তোমরা কি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে চাও, যাদেরকে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেছেন? আল্লাহ্ যাকে পথভ্রান্ত করেন, তুমি তার জন্য কোন পথ পাবে না। (৮৯) তারা চায় যে, তারা যেমন কাফের, তোমরাও তেমনি কাফের হয়ে যাও, যাতে তোমরা এবং তারা সব সমান হয়ে যাও। অতএব, তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করে চলে আসে। অতঃপর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে তাদেরকে পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও হত্যা কর। তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না এবং সাহায্যকারী বানিও না। (৯০) কিন্তু যারা এমন সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হয় যে, তোমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে চুক্তি আছে অথবা তোমাদের কাছে এভাবে আসে যে, তাদের অন্তর তোমাদের সাথে এবং স্বজাতির সাথেও যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক। যদি আল্লাহ্ ইচ্ছে করতেন, তবে তোমাদের উপর তাদেরকে প্রবল করে দিতেন। ফলে তারা অবশ্যই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত। অতঃপর যদি তারা তোমাদের থেকে পৃথক থাকে; তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের সাথে সন্ধি করে, তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ দেননি। (৯১) এখন তুমি আরও এক সম্প্রদায়কে পাবে। তারা তোমাদের কাছেও এবং স্বজাতির কাছেও নির্বিঘ্ন হয়ে থাকতে চায়। যখন তাদেরকে ফ্যাসাদের প্রতি মনোনিবেশ করানো হয়, তখন তারা তাতে নিপতিত হয়, অতএব তারা যদি তোমাদের থেকে নিবৃত্ত না হয়, তোমাদের সাথে সন্ধি না রাখে এবং স্বীয় হস্তসমূহকে বিরত না রাখে, তবে তোমরা তাদেরকে পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও হত্যা কর। আমি তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে প্রকাশ্য যুক্তি-প্রমাণ দান করেছি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে তিনটি দলের কথা বর্ণিত হয়েছে এবং তাদের সম্পর্কে দু' টি বিধান উল্লেখিত হয়েছে। এসব দলের ঘটনাবলী নিম্নোদ্ধৃত রেওয়ায়েতগুলো থেকে জানা যাবে।

প্রথম রেওয়ায়েত ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনে হুমাইদ মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার কতিপয় মুশরেক মক্কা থেকে মদীনায় আগমন করে এবং প্রকাশ করে যে, তারা মুসলমান; হিজরত করে মদীনায় এসেছে। কিছুদিন পর তারা ধর্মত্যাগী হয়ে যায় এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে পণ্যদ্রব্য আনার অজুহাত পেশ করে পুনরায় মক্কা চলে যায়। এরপর তারা আর ফিরে আসেনি। এদের সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে দ্বিমত দেখা দেয়। কেউ কেউ বলল এরা কাফের, আর কেউ কেউ বলল এরা মু'মিন। আল্লাহ্ তাআলা فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ —আয়াতে এদের কাফের হওয়া সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন এবং এদেরকে হত্যা করার বিধান দিয়েছেন।

দ্বিতীয় রেওয়ায়েত ঃ ইবনে আবী শায়বা হাসান বসরী থেকে বর্ণনা করেন যে, বদর ও ওহুদ যুদ্ধের পর সুরাকা ইবনে মালেক মুদলাজী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে প্রার্থনা জানাল, আমাদের গোত্র বনী-মুদলাজের সাথে সন্ধি স্থাপন করুন। তিনি হযরত খালেদকে সন্ধি সম্পন্ন করার জন্যে সেখানে প্রেরণ করলেন। সন্ধির বিষয়বস্তু ছিল এই ঃ

আমরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করব না। কোরায়েশরা মুসলমান হয়ে গেলে আমরাও মুসলমান হয়ে যাব। যেসব গোত্র আমাদের সাথে একতাবদ্ধ হবে, তারাও এ চুক্তিতে আমাদের অংশীদার।

এর পরিপ্রেক্ষিতে وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ থেকে اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

তৃতীয় রেওয়ায়েত ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, ... سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ – আয়াতে আসাদ ও গাতফান গোত্রদ্বয়ের কথা বর্ণিত হয়েছে। তারা মদীনায় এসে বাহ্যতঃ নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করত এবং স্বগোত্রের কাছে বলতঃ আমরা তো বানর ও বিচ্ছুদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তারাই আবার মুসলমানদের কাছে বলত, আমরা তোমাদের ধর্মে আছি!

যাহ্হাক, হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বনী আবদুদ্দারেরও একই অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় রেওয়ায়েত রূহুল-মা'আনীতে এবং তৃতীয় রেওয়ায়েত মাআলেমে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত থানভী (রঃ) বলেন ঃ তৃতীয় রেওয়ায়েতে বর্ণিত লোকদের অবস্থা প্রথম রেওয়ায়েতে বর্ণিত লোকদের অবস্থার মতই হয়ে গেছে। অর্থাৎ, তারা যে পূর্ব থেকেই মুসলমান নয়, একথা রেওয়ায়েত থেকেই প্রমাণিত হয়ে গেছে। এ কারণেই তারা সাধারণ কাফেরদের অনুরূপ। অর্থাৎ, সন্ধিচুক্তি থাকাকালে তাদের সাথে যুদ্ধ করা চলবে না। কিন্তু সন্ধিচুক্তি না থাকা অবস্থায় যুদ্ধ করা চলবে। সেমতে প্রথম রেওয়ায়েতে বর্ণিত লোকদের সম্পর্কে দ্বিতীয় আয়াত অর্থাৎ, فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ – গ্রেফতার করা ও হত্যা করার নির্দেশ এবং তৃতীয় আয়াত

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ – শান্তি চুক্তির সময় তাদের ব্যতিক্রম বিদ্যমান রয়েছে। দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে তাদের শান্তিচুক্তি উল্লেখিত হয়েছে। ব্যতিক্রমকে জোরদার করার জন্য পুনরায় فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ বলে দেয়া হয়েছে।

তৃতীয় রেওয়ায়েতে বর্ণিত লোকদের সম্পর্কে চতুর্থ আয়াত অর্থাৎ, ... سَتَجِدُونَ آخَرِينَ – এ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা যদি তোমাদের থেকে নিবৃত্ত না হয়; বরং লড়াই করে, তবে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ কর। এ থেকে বোঝা যায় যে, তারা সন্ধিচুক্তি করলে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না। – (বয়ানুল–কোরআন)

মোটকথা, এখানে তিন দল লোকের কথা উল্লেখিত হয়েছে ঃ

(১) মুসলমান হওয়ার জন্যে যে সময় হিজরত করা শর্ত সাব্যস্ত হয়, সে সময় সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যারা হিজরত না করে কিংবা হিজরত করার পর দারুল ইসলাম ত্যাগ করে দারুল হরবে চলে যায়।

(২) যারা স্বয়ং মুসলমানদের সাথে 'যুদ্ধ নয়' চুক্তি করে কিংবা এরূপ চুক্তিকারীদের সাথে চুক্তি করে।

(৩) যারা সাময়িকভাবে বিপদ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশে শান্তিচুক্তি করে অতঃপর মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আহ্বান জানানো হলে তাতে অংশগ্রহণ করে এবং চুক্তিতে কায়েম না থাকে।

প্রথম দল সাধারণ কাফেরদের মত। দ্বিতীয় দল হত্যা ও ধরপাকড়ের আওতা বহির্ভূত এবং তৃতীয় দল প্রথম দলের অনুরূপ শাস্তির যোগ্য। এসব আয়াতে মোট দু'টি বিধান উল্লেখিত হয়েছে: অর্থাৎ, সন্ধিচুক্তি না থাকা কালে যুদ্ধ এবং সন্ধিচুক্তি থাকাকালে যুদ্ধ নয়।

হিজরতের বিভিন্ন প্রকার ও বিধান ঃ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ –ইসলামের প্রাথমিক যুগে কাফেরদের দেশ থেকে হিজরত করা প্রত্যেক মুসলমানদের উপর ফরয ছিল। (১) এ কারণে যারা এ ফরয পরিত্যাগ করত, তাদের সাথে আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদের মত ব্যবহার করতে নিষেধ করে দেন। মক্কা বিজিত হলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ঘোষণা করেন ঃ لا هجرة بعد الفتح অর্থাৎ, মক্কা বিজিত হয়ে যখন দারুল ইসলাম হয়ে গেল, তখন সেখান থেকে হিজরত করা ফরয নয়। – (বোখারী) এটা ছিল তখনকার কথা, যখন হিজরত ঈমানের শর্ত ছিল। তখন সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি হিজরত করত না, তাকে মুসলমান মনে করা হত না। কিন্তু পরে এ বিধান রহিত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় প্রকার হিজরত কেয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকবে। এ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ لاتنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة অর্থাৎ, যতদিন তওবা কবুল হওয়ার সময় থাকবে, ততদিন হিজরত বাকী থাকবে। – (বোখারী)

এ হিজরত সম্পর্কে বোখারীর টীকাকার আল্লামা আইনী লিখেন ঃ "স্থায়ী হিজরতের অর্থ হচ্ছে পাপকর্ম পরিত্যাগ করা।" যেমন, এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ المهاجر من هجر مانهى الله عنه – অর্থাৎ, ঐ ব্যক্তি মুহাজির, যে আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ বিষয় বর্জন করে। – (মেরকাত, প্রথম খণ্ড)

এ আলোচনা থেকে জানা গেল যে, পরিভাষায় হিজরত দু'অর্থে ব্যবহৃত হয়– (১) ধর্মের খাতিরে দেশ ত্যাগ করা; যেমন সাহাবায়ে কেরাম স্বদেশ মক্কা ছেড়ে মদীনা ও আবিসিনিয়ায় চলে যান। (২) পাপ কাজ বর্জন করা।

وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا – এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কাফেরদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হারাম। বর্ণিত আছে যে, আনসাররা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর কাছে কাফেরদের বিরুদ্ধে ইহুদীদের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি বললেন ঃ
, এরা দুরাচারী জাতি। তাদের প্রয়োজন আমাদের নেই।–(মাযহারী, ২য় খণ্ড)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ
كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ
كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَ
تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا
فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ
عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ
عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ۚ كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ
قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٩٤﴾
لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ
الْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾

(৯২) মুসলমানের কাজ নয় যে, মুসলমানকে হত্যা করে; কিন্তু ভুলক্রমে। যে ব্যক্তি মুসলমানকে ভুলক্রমে হত্যা করে, সে একজন মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে এবং রক্ত বিনিময় সমর্পণ করবে তার স্বজনদেরকে; কিন্তু যদি তারা ক্ষমা করে দেয়। অতঃপর যদি নিহত ব্যক্তি তোমাদের শত্রু সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয়, তবে মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে এবং যদি সে তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয়, তবে রক্ত বিনিময় সমর্পণ করবে তার স্বজনদেরকে এবং একজন মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে। অতঃপর যে ব্যক্তি না পায়, সে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে গোনাহ্‌ মাফ করানোর জন্যে উপর্যুপরি দুই মাস রোযা রাখবে। আল্লাহ্‌ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (৯৩) যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্‌ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। (৯৪) হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন আল্লাহ্‌র পথে সফর কর, তখন যাচাই করে নিও এবং যে তোমাদেরকে সালাম করে তাকে বলো না যে, তুমি মুসলমান নও। তোমারা পার্থিব জীবনের সম্পদ অন্বেষণ কর, বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র কাছে অনেক সম্পদ রয়েছে। তোমরাও তো এমনি ছিলে ইতিপূর্বে; অতঃপর আল্লাহ্‌ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। অতএব, এখন অনুসন্ধান করে নিও। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদের কাজকর্মের খবর রাখেন। (৯৫) গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান— যাদের কোন সঙ্গত ওযর নেই এবং ঐ মুসলমান যারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ করে— সমান নয়। যারা জান ও মাল দ্বারা জেহাদ করে, আল্লাহ্‌ তাদের পদমর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায় এবং প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ্‌ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ্‌ মুজাহেদীনকে উপবিষ্টদের উপর মহান প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ করেছেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যোগসূত্র ঃ পূর্ব থেকে হত্যা ও যুদ্ধের আলোচনা চলে এসেছে। হত্যা সর্বমোট আট প্রকার। কেননা, নিহত ব্যক্তি হয় মুসলমান, না হয় যিম্মী, না হয় চুক্তিবদ্ধ ও অভয়প্রাপ্ত এবং না হয় দারুল হরবের কাফের হবে। এ চার অবস্থার কোন না কোন একটি হবেই। হত্যাকারী দুই প্রকার ঃ হয় ইচ্ছাকৃত, না হয় ভ্রমবশতঃ। অতএব, মোট প্রকার হল আটটি ঃ (এক) মুসলমানকে ইচ্ছাকৃত হত্যা, (দুই) মুসলমানকে ভ্রমবশতঃ হত্যা, (তিন) যিম্মীকে ইচ্ছাকৃত হত্যা, (চার) যিম্মীকে ভ্রমবশতঃ হত্যা, (পাঁচ) চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃত হত্যা, (ছয়) চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে ভ্রমবশতঃ হত্যা, (সাত) হরবী কাফেরকে ইচ্ছাকৃত হত্যা এবং (আট) হরবী কাফেরকে ভ্রমবশতঃ হত্যা।

এসব প্রকারের মধ্যে কিছু সংখ্যকের বিধান পূর্বে বলা হয়েছে, আর কিছু পরে বর্ণিত হবে এবং কিছু সংখ্যকের বিধান হাদীসে উল্লেখিত রয়েছে। প্রথম প্রকারের পার্থিব বিধান অর্থাৎ, কেসাস ওয়াজেব হওয়া সূরা বাক্বারায় উল্লেখ করা হয়েছে এবং পারলৌকিক বিধান পরবর্তী আয়াত وَمَنْ يَقْتُلْ —এ বর্ণিত হবে। দ্বিতীয় প্রকারের বর্ণনা وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ থেকে فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ আয়াতে আসবে। তৃতীয় প্রকারের বিধান দার-কুত্নীর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যিম্মী হত্যার বিনিময়ে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) মুসলমানের কাছ থেকে কেসাস নিয়েছেন।— (তাখরীজে-হেদায়া)

চতুর্থ প্রকার وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ আয়াতে উল্লেখিত হবে। পঞ্চম প্রকার পূর্ববর্তী রুকূর فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। ষষ্ঠ প্রকারের বিধান চতুর্থ প্রকারের সাথেই উল্লেখিত হয়েছে। কেননা, مِيثَاقٌ তথা চুক্তি অস্থায়ী ও স্থায়ী উভয় প্রকারই হতে পারে। অতএব, যিম্মীও অভয়প্রাপ্ত কাফেরের অন্তর্ভুক্ত। দুররে-মোখতার গ্রন্থের 'দিয়্যৎত' অধ্যায়ের শুরুতে অভয়প্রাপ্ত উভয়ই এর রক্ত-বিনিময় ওয়াজিব হওয়ার মাসআলা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণ করা হয়েছে। সপ্তম ও অষ্টম প্রকারের বিধান স্বয়ং জেহাদ আইনসিদ্ধ হওয়ার মাসআলা থেকে পূর্বেই জানা গেছে। কেননা, জেহাদে দারুল-হরবের কাফেরদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবেই নিহত করা হয়। অতএব, ভ্রমবশতঃ হত্যার বৈধতা আরও সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হবে।— (বয়ানুল-কোরআন)

তিন প্রকার হত্যা ও তার বিধান ঃ عمد প্রথম প্রকার অর্থাৎ, ইচ্ছাকৃত হত্যা। এর সংজ্ঞা এই বাহ্যতঃ ইচ্ছা করে এমন অস্ত্র দ্বারা হত্যা করা, যা লৌহনির্মিত অথবা অঙ্গচ্ছেদনের ব্যাপারে লৌহনির্মিত অস্ত্রের মত। যথা- ধারাল বাঁশ, ধারাল পাথর ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রকার شبه عمد অর্থাৎ, ইচ্ছাকৃত হত্যার সাথে যা সাদৃশ্যপূর্ণ। এর সংজ্ঞা এই ঃ ইচ্ছা করেই হত্যা করা, কিন্তু এমন অস্ত্র দ্বারা নয়, যদ্দ্বারা অঙ্গচ্ছেদ হতে পারে।

তৃতীয় প্রকার خطأ অর্থাৎ, ভ্রমবশতঃ হত্যা। ইচ্ছা ও ধারণায় ভ্রম হওয়া। যেমন, দূর থেকে মানুষকে শিকারী জন্তু কিংবা দারুল-হরবের কাফের মনে করে লক্ষ্য স্থির করতঃ গুলী করে ফেলা কিংবা লক্ষ্যচ্যুতি ঘটা। যেমন, জন্তুকে লক্ষ্য করেই তীর অথবা গুলী ছোঁড়া; কিন্তু তা কোন মানুষের গায়ে লেগে যাওয়া। এগুলো সব ভ্রমবশতঃ হত্যার অন্তর্ভুক্ত।

এখানে ভ্রম বলে 'ইচ্ছা নয়' বোঝানো হয়েছে। অতএব, দ্বিতীয় ও তৃতীয় উভয় প্রকার হত্যাই এর অন্তর্ভুক্ত। উভয় প্রকারের মধ্যে গোনাহ্ ও রক্ত-বিনিময়ের বিধান রয়েছে। তবে উভয় প্রকারের গোনাহ্ ও রক্ত-বিনিময় বিভিন্ন রকম। দ্বিতীয় প্রকারের রক্ত-বিনিময় হচ্ছে একশ উট। উটগুলো চার প্রকারের হবে। অর্থাৎ, প্রত্যেক প্রকারে পাঁচটি করে উট থাকবে। তৃতীয় প্রকারের রক্ত বিনিময়ও একশ উট। কিন্তু উটগুলো হবে পাঁচ প্রকারের। অর্থাৎ, প্রত্যেক প্রকারে বিশটি করে উট থাকবে। তবে রক্ত-বিনিময় মুদ্রার মাধ্যমে দিলে উভয় প্রকারে দশ হাজার দেরহাম অথবা এক হাজার দীনার দিতে হবে। ইচ্ছার কারণে দ্বিতীয় প্রকারের গোনাহ বেশী এবং তৃতীয় প্রকারের গোনাহ্ কম। অর্থাৎ, শুধু অসাবধানতার গোনাহ্ হবে।— (হেদায়া) ক্রীতদাস মুক্তকরণ ওয়াজেব হওয়া এবং তওবা শব্দ দ্বারা একথা বোঝা যায়। উপরোক্ত তিন প্রকারের হত্যার যে স্বরূপ বর্ণিত হল, তা পার্থিব বিধানের দিক দিয়ে। গোনাহ্র দিক দিয়ে ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত হওয়া আন্তরিক ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। শাস্তিবাণীও এরই উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ্ তাআলা জানেন. এদিক দিয়ে প্রথম প্রকার অনিচ্ছাকৃত এবং দ্বিতীয় প্রকার ইচ্ছাকৃত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

০ রক্ত বিনিময়ের উপরোক্ত পরিমাণ তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন নিহত ব্যক্তি পুরুষ হবে। পক্ষান্তরে মহিলা হলে এর পরিমাণ হবে অর্ধেক।— (হেদায়া)

০ মুসলমান ও যিম্মীর রক্ত-বিনিময় সমান। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ دية كل ذى عهد فى عهده الف دينار (হেদায়া, আবু-দাউদ)

০ কাফ্ফারা অর্থাৎ, ক্রীতদাস মুক্ত করা কিংবা রোযা রাখা স্বয়ং হত্যাকারীর করণীয় এবং রক্ত-বিনিময় হত্যাকারীর স্বজনদের যিম্মায় ওয়াজেব। শরীয়তের পরিভাষায় তাদেরকে 'আকেলা' বলা হয়।— (বয়ানুল-কোরআন)

এখানে প্রশ্ন করা উচিত হবে না যে, হত্যাকারীর অপরাধের বোঝা তার স্বজনদের উপর কেন চাপানো হয়? তারা তো নিরপরাধ! এর কারণ এই যে, হত্যাকারীর স্বজনরাও দোষী। তারা তাকে এ ধরনের উচ্ছৃংখল কাজ-কর্মে বাধা দেয়নি। রক্ত-বিনিময়ের ভয়ে ভবিষ্যতে তারা তার দেখাশোনা করতে ত্রুটি করবে না।

০ কাফ্ফারায় বাঁদী ও ক্রীতদাস সমান। رَقَبَة শব্দে উভয়কেই বোঝানো হয়েছে। তবে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিখুঁত হতে হবে।

০ নিহত ব্যক্তির রক্ত-বিনিময় তার ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা হবে। কোন ওয়ারিস স্বীয় অংশ মাফ করে দিলে সে পরিমাণ মাফ হয়ে যাবে। সবাই মাফ করে দিলে সম্পূর্ণ মাফ হয়ে যাবে।

০ যে নিহত ব্যক্তির কোন ওয়ারিস নেই; তার রক্ত-বিনিময় বায়তুল মাল তথা সরকারী কোষাগারে জমা হবে। কেননা, রক্ত-বিনিময় ত্যাজ্য সম্পত্তি। ত্যাজ্য সম্পত্তির বিধান তাই।— (বয়ানুল-কোরআন)

চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায় (যিম্মী অথবা অভয়প্রাপ্ত)-এর ক্ষেত্রে যে রক্ত-বিনিময় ওয়াজেব হয়, বাহ্যতঃ তা তখনই হয়, যখন যিম্মী কিংবা অভয়প্রাপ্তের পরিবার-পরিজন বিদ্যমান থাকে। পক্ষান্তরে যদি তার পরিবার-পরিজন বিদ্যমান না থাকে কিংবা তারা অমুসলমান হয়; মুসলমান কাফেরের ওয়ারিস হতে পারে না বলে এরূপ পরিবার-পরিজন বিদ্যমান থাকা না থাকারই শামিল— এমত ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তি যিম্মী হলে তার রক্ত-বিনিময় বায়তুল মালে জমা হবে। কেননা, যিম্মী বে-ওয়ারিসের ত্যাজ্য সম্পত্তি রক্ত-বিনিময়সহ বায়তুল মালে যায়। (দুররে মোখতার) নিহত ব্যক্তি যিম্মী না হলে রক্ত-বিনিময় ওয়াজেব হবে না।— (বয়ানুল -কোরআন)

০ কাফ্ফারার রোযায় যদি রোগ-ব্যাধির কারণে উপর্যুপরিতা ক্ষুণ্ন হয়, তবে প্রথম থেকে রোযা রাখতে হবে। অবশ্য মহিলাদের ঋতুস্রাবের কারণে যে রোযা ভাংতে হয় তাতে উপর্যুপরিতা ক্ষুণ্ন হবে না।

০ ওযরবশতঃ রোযা রাখতে সক্ষম না হলে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত তওবা করবে।

০ ইচ্ছাকৃত হত্যার বেলায় কাফ্ফারা নেই— তওবা করা উচিত।— (বয়ানুল-কোরআন)

মুসলমান মনে করার জন্যে ইসলামী লক্ষণাদিই যথেষ্ট ঃ উল্লেখিত তিনটি আয়াতের মধ্যে প্রথম আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, কেউ মুসলমান বলে নিজেকে পরিচয় দিলে অনুসন্ধান ব্যতিরেকে তার উক্তিকে কপটতা মনে করা কোন মুসলমানের জন্যেই বৈধ নয়। এ ব্যাপারে কোন কোন সাহাবী থেকে ভুল সংঘটিত হওয়ার কারণে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

তিরমিযী ও মুসনাদে-আহমদ গ্রন্থে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, বনী-সুলায়মের এক ব্যক্তি একদিন ছাগলের পাল চরানো অবস্থায় একদল মুজাহিদ সাহাবীর সম্মুখে পতিত হয়। সে মুজাহিদ দলকে সালাম করল। তার পক্ষ থেকে এ বিষয়ের কার্যতঃ অভিব্যক্তি ছিল যে, সে একজন মুসলমান। কিন্তু মুজাহিদরা মনে করলেন যে, সে শুধু জীবন ও ছাগলের পাল রক্ষা করার জন্যেই এ প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে। এ সন্দেহে তাঁরা লোকটিকে হত্যা করে তার ছাগলের পাল অধিকার করে নিলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত করলেন। এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ইসলামী পদ্ধতিতে তোমাকে সালাম করে, তার সম্পর্কে এরূপ সন্দেহ করো না যে, সে প্রতারণাপূর্বক নিজেকে মুসলমান বলে প্রকাশ করেছে। তার অর্থ-সম্পদ যুদ্ধলব্ধ মাল মনে করে অধিকারে নিও না।— (ইবনে-কাসীর)

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে এ দুটি ঘটনা ছাড়া আরও ঘটনাবলী বর্ণিত রয়েছে, কিন্তু সুবিজ্ঞ তফসীরবিদগণ বলেছেন, এসব রেওয়ায়েতের মাঝে কোন বিরোধ নেই। সমষ্টিগতভাবে কয়েকটি ঘটনাও আয়াতটি অবতরণের হেতু হতে পারে।

ঘটনার তদন্ত না করে সিদ্ধান্ত নেয়া বৈধ নয় ঃ আলোচ্য আয়াতের প্রথম বাক্যে একটি সাধারণ নির্দেশ রয়েছে যে, মুসলমানরা কোন কাজ সত্যাসত্য যাচাই না করে শুধু ধারণার বশবর্তী হয়ে করবে না। বলা হয়েছে ঃ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا অর্থাৎ, তোমরা যখন আল্লাহ্র পথে সফর কর, তখন সত্যাসত্য অনুসন্ধান করে সব কাজ করো। শুধু ধারণার বশবর্তী হয়ে কাজ করলে প্রায়ই ভুল হয়ে যায়। সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সফরে সংঘটিত হয়েছিল বলে আয়াতে সফর উল্লেখ করা হয়েছে। কিংবা এর কারণ এও হতে পারে যে, সাধারণতঃ সফরে থাকা অবস্থায় অন্যের ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দেয়। নিজ শহরে অন্যের অবস্থা সাধারণতঃ জানা থাকে। তাই আসল নির্দেশটি ব্যাপক। অর্থাৎ, সফরে হোক কিংবা বাসস্থানে হোক, সর্বত্রই খোঁজ-খবর না নিয়ে কোন

পদক্ষেপ গ্রহণ করা বৈধ নয়। এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ ভেবে-চিন্তে কাজ করা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এবং তড়িঘড়ি কাজ করা শয়তানের পক্ষ থেকে।—(বাহ্‌রে-মুহীত)

কেবলার অনুসারীকে কাফের না বলার তাৎপর্য ঃ এ আয়াত থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা জানা গেল যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমানরূপে পরিচয় দেয়, কলেমা পাঠ করে কিংবা অন্য কোন ইসলামী বৈশিষ্ট্য যথা নামায, আযান ইত্যাদিতে যোগদান করে, তাকে মুসলমান মনে করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। তার সাথে মুসলমানদের মতই ব্যবহার করতে হবে এবং সে আন্তরিকভাবে মুসলমান হয়েছে না কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, একথা প্রমাণ করার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

এছাড়া এ ব্যাপারে তার কাজকর্মের উপরও উপরোক্ত নির্দেশ নির্ভরশীল হবে না। মনে করুন, সে নামায পড়ে না, রোযা রাখে না এবং সর্বপ্রকার গোনাহে জড়িত, তবুও তাকে ইসলাম বহির্ভূত বলার কিংবা তার সাথে কাফেরের মত ব্যবহার করার অধিকার কারও নেই। এ কারণেই ইমাম আযম আবু-হানীফা (রহঃ) বলেন ঃ "আমরা কেবলার অনুসারীকে কোন পাপ কার্যের কারণে কাফের সাব্যস্ত করি না।" কোন কোন হাদীসে এ জাতীয় উক্তি বর্ণিত আছে যে, যত গোনাহ্‌গার দুষ্কর্মীই হোক, কেবলার অনুসারীকে কাফের বলো না।

কিন্তু এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ও স্মরণযোগ্য যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলে, কোরআন ও হাদীস অনুযায়ী তাকে কাফের বলা বা মনে করা বৈধ নয়। এর সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, কুফরের নিশ্চিত লক্ষণ, এরূপ কোন কথা বা কাজ যতক্ষণ তার দ্বারা সংঘটিত না হবে, ততক্ষণ তার ইসলামের স্বীকারোক্তিকে বিশুদ্ধ মনে করা হবে এবং তাকে মুসলমানই বলা হবে। তার সাথে মুসলমানের মতই ব্যবহার করা হবে এবং তার আন্তরিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করার অধিকার কারও থাকবে না।

কিন্তু যে ব্যক্তি ইসলাম ও ঈমান প্রকাশ করার সাথে সাথে কিছু কুফরী কলেমাও বকাবকি করে, অথবা প্রতিমাকে আভূমি নত হয়ে প্রণাম করে কিংবা ইসলামের কোন অকাট্য ও স্বতঃসিদ্ধ নির্দেশ অস্বীকার করে কিংবা কাফেরদের কোন ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে; যেমন, গলায় পৈতা পরা ইত্যাদি, তবে তাকে সন্দেহাতীতভাবে কুফরী কাজকর্মের কারণে কাফের আখ্যা দেওয়া হবে। আলোচ্য আয়াতের শব্দে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। নতুবা ইহুদী ও খৃষ্টান সবাই নিজেকে মুমিন-মুসলমান বলত। মুসায়লামা কায্‌যাব শুধু কলেমার স্বীকারোক্তিই নয়, ইসলামী বৈশিষ্ট্য, যথা নামায, আযান ইত্যাদিরও অনুগামী ছিল। আযানে 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-এর সাথে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্'ও উচ্চারণ করত। কিন্তু সাথে সাথে সে নিজেকেও নবী-রাসূল ও ওহীর অধিকারী বলে দাবী করত, যা কোরআন ও সুন্নাহ্‌র প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ। এ কারণেই তাকে ধর্মত্যাগী সাব্যস্ত করা হয় এবং সাহাবায়ে কেরামের এজমা তথা সর্বসম্মতিক্রমে তার বিরুদ্ধে জেহাদ করে তাকে হত্যা করা হয়।

মোটামুটি মাসআলা হল এই যে, প্রত্যেক কলেমা উচ্চারণকারী কেবলার অনুসারীকে মুসলমান মনে কর। তার অন্তরে কি আছে, তা খোঁজাখুঁজি করার প্রয়োজন নেই, অন্তরের বিষয় আল্লাহ্‌র হাতে সমর্পণ কর। তবে ঈমান প্রকাশের সাথে সাথে ঈমান বিরোধী কোন কাজ সংঘটিত হলে তাকে মুর্তাদ অর্থাৎ, ধর্মত্যাগী মনে কর। এর জন্যে শর্ত এই যে, কাজটি যে ঈমান বিরোধী, তা অকাট্য ও নিশ্চিত হতে হবে। এতে কোনরূপ দ্ব্যর্থতার অবকাশ না থাকা চাই।

دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا
رَّحِيْمًا ﴿٩٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ
اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ؕ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ
فِى الْاَرْضِ ؕ قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا
فِيْهَا ؕ فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿٩٧﴾
اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ
لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا ﴿٩٨﴾
فَاُولٰٓئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ
عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٩٩﴾ وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ
فِى الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً ؕ وَمَنْ يَّخْرُجْ
مِنْ ۢ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ
الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا
رَّحِيْمًا ﴿١٠٠﴾ وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ ۖ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ﴿١٠١﴾

(৯৬) এগুলো তাঁর পক্ষ থেকে পদমর্যাদা, ক্ষমা ও করুণা; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও করুণাময়। (৯৭) যারা নিজের অনিষ্ট করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে ঃ এ ভূখণ্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলে ঃ আল্লাহ্‌র পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, এদের বাসস্থান হল জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ স্থান। (৯৮) কিন্তু পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্যে যারা অসহায়, তারা কোন উপায় করতে পারে না এবং পথও জানে না। (৯৯) অতএব, আশা করা যায়, আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। (১০০) যে কেউ আল্লাহ্‌র পথে দেশত্যাগ করে, সে এর বিনিময়ে অনেক স্থান ও সচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে। যে কেউ নিজ গৃহ থেকে বের হয় আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি হিজরত করার উদ্দেশে, অতঃপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তার সওয়াব আল্লাহ্‌র কাছে অবধারিত হয়ে যায়। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (১০১) যখন তোমরা কোন দেশ সফর কর, তখন নামাযে কিছুটা হ্রাস করলে তোমাদের কোন গোনাহ্ নেই, যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, কাফেররা তোমাদেরকে উত্ত্যক্ত করবে। নিশ্চয় কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হিজরতের সংজ্ঞা ঃ আলোচ্য চারটি আয়াতে হিজরতের ফযীলত, বরকত ও বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। অভিধানে হিজরত শব্দটি 'হিজরান' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, অসন্তুষ্টচিত্তে কোন কিছুকে ত্যাগ করা। সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ভাষায় দেশত্যাগ করাকে হিজরত বলা হয়। শরীয়তের পরিভাষায় দারুল-কুফর তথা কাফেরদের দেশ ত্যাগ করে দারুল-ইসলাম তথা মুসলমানদের দেশে গমন করার নাম হিজরত।—(রূহুল-মা'আনী)

মোল্লা আলী ক্বারী মেশকাতের শরায় বলেন ঃ ধর্মীয় কারণে কোন দেশ ত্যাগ করাও হিজরতের অন্তর্ভুক্ত।— (মেরকাত, ১ম খণ্ড, ৩৯ পৃঃ)

মুহাজির সাহাবীগণের সম্পর্কে অবতীর্ণ সূরা হাশরের اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কোন দেশের কাফেররা যদি মুসলমানকে মুসলমান হওয়ার কারণে দেশ থেকে জোর-জবরদস্তিমূলকভাবে বহিষ্কার করে তবে তাও হিজরতের অন্তর্ভুক্ত।

হিজরতের ফযীলতঃ জেহাদ সম্পর্কিত আয়াতসমূহ যেমন সমগ্র কোরআন পাকে ছড়িয়ে রয়েছে, তেমনি হিজরতের বর্ণনাও কোরআন পাকের অধিকাংশ সূরায় একাধিকবার বিবৃত হয়েছে। সবগুলো আয়াত একত্রিত করলে জানা যায় যে, হিজরত সম্পর্কিত আয়াতসমূহে তিন রকমের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। (এক) হিজরতের ফযীলত, (দুই) হিজরতের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বরকত এবং (তিন) সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দারুল-কুফর থেকে হিজরত না করার কারণে শাস্তিবাণী।

হিজরতের ফযীলত সম্পর্কিত প্রথম বিষয়বস্তু সূরা বাক্বারার এক আয়াতে রয়েছে—

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অর্থাৎ, যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ করেছে, তারা আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ-প্রার্থী। আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময়।

দ্বিতীয় আয়াত – সূরা তওবায় আছে ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ
وَاَنْفُسِهِمْ ۙ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ

অর্থাৎ, যারা ঈমান এনেছে ও হিজরত করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথে জান ও মাল দ্বারা জেহাদ করেছে, তারা আল্লাহ্‌র কাছে বিরাট পদমর্যাদার অধিকারী এবং তারাই সফলকাম।

তৃতীয় আয়াত— আলোচ্য সূরা নিসার ঃ

وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ ۢ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ
الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রসূলের নিয়তে নিজ গৃহ থেকে বেরিয়ে

পথেই মৃত্যুবরণ করে তার সওয়াব আল্লাহ্‌র যিম্মায় সাব্যস্ত হয়ে যায়।

কোন কোন রেওয়ায়েতমতে এ আয়াতটি হযরত খালেদ ইবনে হেযাম সম্পর্কে আবিসিনিয়ায় হিজরতের সময় অবতীর্ণ হয়। তিনি মক্কা থেকে হিজরতের নিয়তে আবিসিনিয়ার পথে রওয়ানা হয়ে যান। পথিমধ্যে সর্প-দংশনে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। মোটকথা, উপরোক্ত তিনটি আয়াতে দারুল-কুফর থেকে হিজরতে উৎসাহদান এবং এর বিরাট ফযীলত সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ 'হিজরত পূর্বকৃত সব গোনাহ্‌কে নিঃশেষ করে দেয়।

হিজরতের বরকতঃ হিজরত বরকত সম্পর্কে সুরা নাহ্‌লের এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ

"যারা আল্লাহ্‌র জন্যে হিজরত করে নির্যাতিত হওয়ার পর, আমি তাদেরকে দুনিয়াতে উত্তম ঠিকানা দান করব এবং পরকালের বিরাট সওয়াব তো রয়েছেই, যদি তারা বুঝে।"

সূরা নিসার উল্লেখিত চার আয়াতে বলা হয়েছেঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করবে, সে পৃথিবীতে অনেক জায়গা ও সুযোগ-সুবিধা পাবে।"

আয়াতে বর্ণিত مراغم শব্দটি একটি ধাতু। এর অর্থ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হওয়া। স্থানান্তরিত হওয়ার জায়গাকেও অনেক সময় مُرٰغَمًا বলে দেয়া হয়।

এ আয়াতদ্বয়ে হিজরতের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ বরকত বর্ণিত হয়েছে। এতে আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদা রয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রসূলের জন্যে হিজরত করে, আল্লাহ্ তার জন্যে দুনিয়াতে অনেক পথ খুলে দেন। সে দুনিয়াতেও উত্তম অবস্থান লাভ করে এবং পরকালের সওয়াব ও পদমর্যাদা তো কল্পনাতীত।

মোটকথা এই যে, আল্লাহ্ তাআলা কোরআন পাকে মুহাজিরদের জন্যে যে ওয়াদা করেছেন, জগদ্বাসী তা স্বচক্ষে দেখে নিয়েছে। তবে আলোচ্য আয়াতেই এ শর্ত বর্ণিত হয়েছে যে, هَاجَرُوْا فِي اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে হিজরত হওয়া চাই। পার্থিব ধন-সম্পদ, রাজত্ব,সম্মান অথবা প্রভাব-প্রতিপত্তির অন্বেষায় হিজরত না হওয়া চাই। বোখারীর হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এ উক্তিও বর্ণিত আছে যে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রসূলের নিয়তে হিজরত করে, তার হিজরত আল্লাহ্ ও রসূলের জন্যেই হয়। অর্থাৎ, এটিই বিশুদ্ধ হিজরত। এর ফযীলত ও বরকত কোরআন পাকে বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে "যে ব্যক্তি অর্থের অন্বেষণে কিংবা কোন মহিলাকে বিয়ে করার নিয়তে হিজরত করে, তার হিজরতের বিনিময়ে ঐ বস্তুই পাবে, যার জন্য সে হিজরত করে।"

আজকাল কিছুসংখ্যক মুহাজিরকে দুর্দশাগ্রস্ত দেখা যায়। হয় তারা এখনও অন্তর্বর্তীকালে অবস্থান করছে, অর্থাৎ, হিজরতের প্রাথমিক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে, না হয় তারা সঠিক অর্থে মুহাজির নয়। স্বীয় নিয়ত ও অবস্থা সংশোধনের প্রতি তাদের মনোনিবেশ করা উচিত। নিয়ত ও আমল সংশোধন করার পর তারা আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদার সত্যতা স্বচক্ষে দেখতে পাবে।

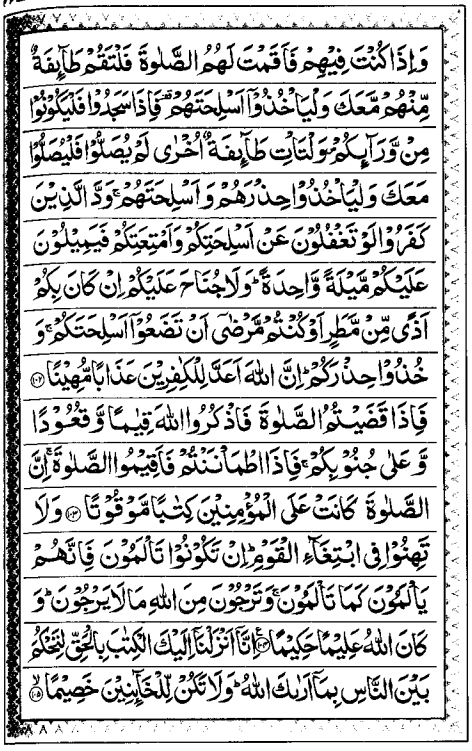

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ
مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا
مِنْ وَّرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا
مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ
عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ
أَذًى مِّنْ مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى أَنْ تَضَعُوٓا أَسْلِحَتَكُمْ وَ
خُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللّٰهَ أَعَدَّ لِلْكٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٠٢﴾
فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُودًا
وَّعَلٰى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ إِنَّ
الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰبًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾ وَلَا
تَهِنُوا فِي ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ
يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَ
كَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٠٤﴾ إِنَّآ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ
بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ أَرٰىكَ اللّٰهُ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

(১০২) যখন আপনি তাদের মধ্যে থাকেন, অতঃপর নামাযে দাঁড়ান, তখন যেন একদল দাঁড়ায় আপনার সাথে এবং তারা যেন স্বীয় অস্ত্র সাথে নেয়। অতঃপর যখন তারা সেজদা সম্পন্ন করে, তখন আপনার কাছ থেকে যেন সরে যায় এবং অন্য দল যেন আসে, যারা নামায পড়েনি। অতঃপর তারা যেন আপনার সাথে নামায পড়ে এবং আত্মরক্ষার হাতিয়ার সাথে নেয়। কাফেররা চায় যে, তোমরা কোনরূপে অসতর্ক থাক, যাতে তারা একযোগে তোমাদেরকে আক্রমণ করে বসে। যদি বৃষ্টির কারণে তোমাদের কষ্ট হয় অথবা তোমরা অসুস্থ হও, তবে স্বীয় অস্ত্র পরিত্যাগ করায় তোমাদের কোন গোনাহ্ নেই এবং সাথে নিয়ে নাও তোমাদের আত্মরক্ষার অস্ত্র। নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফেরদের জন্যে অপমানকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। (১০৩) অতঃপর যখন তোমরা নামায সম্পন্ন কর, তখন দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর। অতঃপর যখন বিপদমুক্ত হয়ে যাও, তখন নামায ঠিক করে পড়। নিশ্চয় নামায মুসলমানদের উপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। (১০৪) তাদের পশ্চাদ্ধাবনে শৈথিল্য করো না। যদি তোমরা আঘাতপ্রাপ্ত, তবে তারাও তো তোমাদের মতই হয়েছে আঘাতপ্রাপ্ত এবং তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে আশা কর, যা তারা আশা করে না। আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (১০৫) নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষের মধ্যে ফয়সালা করেন, যা আল্লাহ্ আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করান। আপনি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষ থেকে বিতর্ককারী হবেন না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যোগসূত্র : পূর্বে জেহাদ ও হিজরতের আলোচনা ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জেহাদ ও হিজরতের জন্যে সফর করতে হয় এবং এ জাতীয় সফরে শত্রুদের পক্ষ থেকে বিপদাশঙ্কাও থাকে। তাই সফর ও আতঙ্কাবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে নামাযে প্রদত্ত বিশেষ সুবিধা ও সংক্ষিপ্ততা আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হচ্ছে।

সফর ও কসরের বিধান : তিন মনযিল থেকে কম দূরত্বের সফরে পূর্ণ নামায পড়া হয়।

o সফর শেষ করে গন্তব্যস্থলে পৌছার পর যদি সেখানে পনর দিনের কম সময় অবস্থান করার ইচ্ছা থাকে, তবে সে অবস্থানও সফরের অন্তর্ভুক্ত। এমতাবস্থায় চার রাকআতবিশিষ্ট ফরয নামায অর্ধেক পড়তে হবে। একে শরীয়তের পরিভাষায় 'কসর' বলা হয়। পক্ষান্তরে যদি একই জনপদে পনের দিন অথবা তদূর্ধ্ব সময় অবস্থান করার ইচ্ছা থাকে, তবে তা সাময়িক বাসস্থান হিসেবে গণ্য হবে। এমন জায়গায় অস্থায়ী বাসস্থানের মত কসর পড়তে হবে না— পূর্ণ নামায পড়তে হবে।

o কসর শুধু তিন ওয়াক্তের ফরয নামাযে হবে। মাগরিব, ফজর, এবং সুন্নত ও বেতরের নামাযে কসর নেই।

o পূর্ণ নামাযের স্থলে অর্ধেক পড়ার মধ্যে কারও মনে এরূপ ধারণা আনাগোনা করে যে, বোধহয় এতে নামায পূর্ণ হলো না, এটা ঠিক নয়। কারণ, কসরও শরীয়তেরই নির্দেশ। এ নির্দেশ পালনে গোনাহ্ হয় না; বরং সওয়াব পাওয়া যায়।

o আয়াতে وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ বলা হয়েছে (অর্থাৎ, আপনি যখন তাদের মধ্যে থাকেন), এতে এরূপ মনে করার অবকাশ নেই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর তিরোধানের পর এখন 'সালাতুল-খওফ'-এর বিধান নেই। কেননা, তখনকার অবস্থা অনুযায়ী আয়াতে এ শর্ত বর্ণিত হয়েছে। নবী বিদ্যমান থাকলে ওযর ব্যতীত অন্য কেউ নামাযে ইমাম হতে পারে না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পর এখন যে ইমাম হবেন, তিনিই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন এবং 'সালাতুল-খওফ' পড়াবেন। সব ফেকাহ্‌বিদের মতে সালাতুল-খওফের বিধান এখনও অব্যাহত রয়েছে— রহিত হয়নি।

o মানুষের পক্ষ থেকে বিপদাশঙ্কার কারণে 'সালাতুল-খওফ' পড়া যেমন জায়েয, তেমনিভাবে যদি বাঘ-ভালুক কিংবা অজগর ইত্যাদির ভয় থাকে এবং নামাযের সময়ও সংকীর্ণ হয়, তাহলে তখনও 'সালাতুল খওফ' পড়া জায়েয।

o আয়াতে উভয় দলের এক এক রাকআত পড়ার নিয়ম বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় রাকআতের নিয়ম হাদীসে উল্লেখিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দু'রাকআতের পর সালাম ফিরিয়েছেন।—(বিস্তারিত বিবরণ হাদীসে দ্রষ্টব্য)

আয়াতের শানে নুযূল : সূরা নিসার ১০৫ থেকে সাতটি আয়াত এক বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু কোরআনের সাধারণ পদ্ধতি অনুযায়ী এ ব্যাপারে প্রদত্ত নির্দেশাবলী এ ঘটনার সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং বর্তমান ও ভবিষ্যতে আগমনকারী মুসলমানদের জন্যে ব্যাপক। এছাড়া এসব নির্দেশের মধ্যে অনেক মৌলিক ও শাখাগত মাসআলাও রয়েছে।

وَّاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٠٦﴾ وَلَا تُجَادِلْ
عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ
كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا ﴿١٠٧﴾ يَّسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا
يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لَا يَرْضٰى
مِنَ الْقَوْلِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ﴿١٠٨﴾ هٰٓاَنْتُمْ
هٰٓؤُلَاۗءِ جٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۣ فَمَنْ يُّجَادِلُ
اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَمْ مَّنْ يَّكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ﴿١٠٩﴾ وَ
مَنْ يَّعْمَلْ سُوْۗءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ
اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١١٠﴾ وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰي
نَفْسِهٖ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١١١﴾ وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْۗـــَٔةً
اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْۗــــًٔا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿١١٢﴾
وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّاۗىِٕفَةٌ مِّنْهُمْ
اَنْ يُّضِلُّوْكَ ۭ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ
شَيْءٍ ۭ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ
مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۭ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴿١١٣﴾

(১০৬) এবং আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১০৭) যারা মনে বিশ্বাসঘাতকতা পোষণ করে তাদের পক্ষ থেকে বিতর্ক করবেন না। আল্লাহ্ পছন্দ করেন না তাকে, যে বিশ্বাসঘাতক পাপী হয়। (১০৮) তারা মানুষের কাছে লজ্জিত হয় এবং আল্লাহ্‌র কাছে লজ্জিত হয় না। তিনি তাদের সাথে রয়েছেন, যখন তারা রাত্রে এমন বিষয়ে পরামর্শ করে, যাতে আল্লাহ্ সম্মত নন। তারা যাকিছু করে, সবই আল্লাহ্‌র আয়ত্তাধীন। (১০৯) শুনছ? তোমরা তাদের পক্ষ থেকে পার্থিব জীবনে বিবাদ করছ, অতঃপর কেয়ামতের দিনে তাদের পক্ষ হয়ে আল্লাহ্‌র সাথে কে বিবাদ করবে অথবা কে তাদের কার্যনির্বাহী হবে। (১১০) যে গোনাহ্ করে কিংবা নিজের অনিষ্ট করে, অতঃপর আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহ্‌কে ক্ষমাশীল, করুণাময় পায়। (১১১) যে কেউ পাপ করে, সে নিজের পক্ষেই করে। আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (১১২) যে ব্যক্তি ভুল কিংবা গোনাহ করে, অতঃপর কোন নিরপরাধের উপর অপবাদ আরোপ করে সে নিজের মাথায় বহন করে জঘন্য মিথ্যা ও প্রকাশ্য গোনাহ্। (১১৩) যদি আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও করুণা না হত, তবে তাদের একদল আপনাকে পথভ্রষ্ট করার সংকল্প করেই ফেলেছিল। তারা পথভ্রান্ত করতে পারে না কিন্তু নিজেদেরকেই এবং আপনার কোন অনিষ্ট করতে পারে না। আল্লাহ্ আপনার প্রতি ঐশীগ্রন্থ ও প্রজ্ঞা অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনাকে এমন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যা আপনি জানতেন না। আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র করুণা অসীম।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, হিজরতের প্রাথমিক যুগে সাধারণ মুসলমানরা দারিদ্র্য ও অনাহারে দিনাতিপাত করতেন। তাঁদের সাধারণ খাদ্য ছিল যবের আটা কিংবা খেজুর অথবা গমের আটা। এগুলো খুব দুর্লভ ছিল এবং মদীনায় প্রায় পাওয়াই যেত না। সিরিয়া থেকে চালান এলে কেউ কেউ মেহমানদের জন্যে কিংবা বিশেষ প্রয়োজনের জন্য ক্রয় করে রাখত। হযরত রেফাআহ্ এমনিভাবে কিছু গমের আটা কিনে একটি বস্তায় রেখে দিয়েছিলেন। এ বস্তার মধ্যেই কিছু অস্ত্রশস্ত্রও রেখে একটি ছোট কক্ষে সংরক্ষিত রেখেছিলেন। বশীর কিংবা তো'মা সিঁধ কেটে বস্তা বের করে নেয়। সকালে হযরত রেফাআহ্ ব্যাপার দেখে ভ্রাতুষ্পুত্র কাতাদার কাছে ঘটনা বিবৃত করলেন। সবাই মিলে মহল্লায় খোঁজাখুঁজি শুরু করলেন। কেউ কেউ বলল, আজ রাত্রে আমরা বনী-উবায়রাকের ঘরে আগুন জ্বলতে দেখেছি। মনে হয় সে খাদ্যই পাকানো হয়েছে। রহস্য ফাঁস হয়ে পড়ার সংবাদ পেয়ে বনী-উবায়রাক নিজেরাই এসে হাযির হল এবং বলল এটা লবীদ ইবনে সাহ্‌লের কাজ। আমরা তো তাকে খাঁটি মুসলমান বলেই জানতাম। খবর পেয়ে লবীদ তরবারী কোষমুক্ত করে এলেন এবং বললেন ঃ তোমরা আমাকে চোর বলছ? শুনে নাও, চুরির রহস্য উদ্ঘাটিত না হওয়া পর্যন্ত আমি এ তরবারি কোষবদ্ধ করব না।

বনী-উবায়রাক আস্তে বলল ঃ আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার নাম কেউ নেয় না। আপনার দ্বারা একাজ হতেও পারে না। বগভী ও ইবনে-জরীরের রেওয়ায়েতে এস্থলে বলা হয়েছে যে, বনী-উবায়রাক জনৈক ইহুদীর প্রতি চুরির অপবাদ আরোপ করল। ধূর্ততাবশতঃ তারা আটার বস্তা সামান্য ছিঁড়ে ফেলেছিল। ফলে রেফাআহ্‌র গৃহ থেকে উপরোক্ত ইহুদীর গৃহ পর্যন্ত আটার লক্ষণ পাওয়া গেল। জানাজানির পর চোরাই অস্ত্রশস্ত্র এবং লৌহ-বর্মও ইহুদীর কাছাকাছি রেখে দিল। তদন্তের সময় তার গৃহ থেকেই এগুলো বের হল। ইহুদী কসম খেয়ে বলল, ইবনে-উবায়রাক আমাকে লৌহ-বর্মটি দিয়েছে।

তিরমিযীর রেওয়ায়েত ও বগভীর রেওয়ায়েতে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, বনী-উবায়রাক প্রথমে দেখল যে, এটা ধোপে টিকবে না, তখন ইহুদীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিল। যাহোক, এখন বিষয়টি বনী-উবায়রাক ও ইহুদীর মধ্যে গিয়ে গড়ায়।

এদিকে বিভিন্ন পন্থায় হজরত কাতাদা ও রেফাআহ্‌র প্রবল ধারণা জন্মেছিল যে, এটি বনী-উবায়রাকেরই কীর্তি। হযরত কাতাদা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে চুরির ঘটনা এবং তদন্তক্রমে বনী-উবায়রাকের প্রতি প্রবল ধারণার কথা আলোচনা করলেন। বনী-উবায়রাক সংবাদ পেয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে এসে রেফাআহ্ ও কাতাদার বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে, শরীয়তসম্মত প্রমাণ ছাড়াই তারা আমাদের নামে চুরির অপবাদ আরোপ করছে। অথচ চোরাই মাল ইহুদীর ঘর থেকে বের হয়েছে। আপনি তাদেরকে বারণ করুন, তারা যেন আমাদেরকে দোষারোপ না করে এবং ইহুদীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।

বাহ্যিক অবস্থা ও লক্ষণাদি দৃষ্টে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এরও প্রবল ধারণা জন্মে যে, এ কাজটি ইহুদীর। বনী-উবায়রাকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ঠিক নয়। বগভীর রেওয়ায়েতে আছে, এমন কি, তিনি ইহুদীর উপর চুরির শাস্তি প্রয়োগ করার এবং হস্ত কর্তন করার বিষয়ও স্থির করে ফেলেন।

এদিকে কাতাদা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলে তিনি বললেন ঃ আপনি বিনা প্রমাণে একটি মুসলমান পরিবারকে চুরির জন্য দোষারোপ করছেন। এতে হযরত কাতাদা খুব দুঃখিত হলেন এবং আফসোস করে বললেন, আমার মাল গেলেও এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে কোন কিছু না বলাই ভাল ছিল। এমনিভাবে হযরত রেফাআহ্কেও তিনি এ ধরনের কথা বললেন। রেফাআহ্ও ধৈর্যধারণ করলেন এবং বললেন ঃ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ (আল্লাহ্ সহায়)।

বেশীদিন অতিবাহিত না হতেই এ ব্যাপারে কোরআন পাকের পূর্ণ একটি রুকূ অবতীর্ণ হয়। এর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সামনে ঘটনার বাস্তবরূপ তুলে ধরা হয় এবং এ জাতীয় ব্যাপারাদি সম্পর্কে সাধারণ নির্দেশ দান করা হয়।

কোরআন পাক বনী উবায়রাকের চুরি ফাঁস করে ইহুদীকে দোষমুক্ত করে দিল। এতে বনী-উবায়রাক বাধ্য হয়ে চোরাই মাল রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে সমর্পণ করল। তিনি রেফাআহ্কে তা প্রত্যর্পণ করলেন। রেফাআহ্ সমুদয় অস্ত্র-শস্ত্র জেহাদের জন্যে ওয়াকফ্ করে দিলেন। এদিকে বনী-উবায়রাকের চুরি প্রকাশ হয়ে পড়লে বশীর ইবনে-উবায়রাক মদীনা থেকে পলায়ন করল এবং মক্কার কাফেরদের সাথে একাত্ম হয়ে গেল। সে পূর্বে মুনাফেক থাকলে এবার প্রকাশ্য কাফের এবং পূর্বে মুসলমান থাকলে এবার ধর্মত্যাগী হয়ে গেল।

তফসীর বাহরে-মুহীতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ ও রসূলের বিরুদ্ধাচরণের পাপ বশীরকে মক্কায়ও শান্তিতে থাকতে দেয়নি। যে মহিলার গৃহে সে আশ্রয় নিয়েছিল, সে ঘটনা জানতে পেয়ে তাকে বহিষ্কার করে দিল। এমনিভাবে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে সে এক ব্যক্তির গৃহে সিঁধ কাটে এবং প্রাচীর চাপা পড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এ পর্যন্ত ছিল ঘটনার বিবরণ; এবার এ সম্পর্কে কোরআনের বক্তব্য শুনুন। প্রথম আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে চুরির ঘটনার আসল স্বরূপ বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ আমি আপনার প্রতি কোরআন ও ওহী এজন্যে অবতারণ করেছি, যাতে আপনি আল্লাহ্-প্রদত্ত জ্ঞান ও তত্ত্ব অনুযায়ী ফয়সালা করেন এবং বিশ্বাসঘাতকদের অর্থাৎ, বনী-উবায়রাকের পক্ষপাতিত্ব না করেন। যদিও বাহ্যিক অবস্থা ও লক্ষণাদি দৃষ্টে চুরির ব্যাপারে ইহুদীর প্রতি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রবল ধারণা হওয়া কোন গোনাহ্ ছিল না; কিন্তু ছিল বাস্তব ঘটনার পরিপন্থী। তাই দ্বিতীয় আয়াতে তাঁকে ক্ষমা প্রার্থনার আদেশ দেয়া হয়েছে। কেননা, পয়গম্বরগণের স্থান অনেক উর্ধ্বে। এতটুকু ব্যাপারও তাঁর পক্ষে শোভা পায় না।

তৃতীয় (অর্থাৎ, ১০৭) আয়াতে পুনরায় তাকিদ করা হয়েছে যে, আপনি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে পক্ষে কোন বিতর্ক করবেন না। কেননা, আল্লাহ্ তাদেরকে পছন্দ করে না।

চতুর্থ (অর্থাৎ, ১০৮) আয়াতে বিশ্বাসঘাতকদের জঘন্য অবস্থা ও নির্বুদ্ধিতা ব্যক্ত হয়েছে যে, তারা নিজেদের মত মানুষের কাছে তো লজ্জাবোধ করে এবং চুরি গোপন করে; কিন্তু আল্লাহ্র কাছে লজ্জিত হয় না, যিনি সর্বদা তাদের সাথে রয়েছেন এবং তাদের প্রত্যেক কাজ নিরীক্ষণ করছেন; বিশেষ করে এ ঘটনাটি দেখেছেন যে, তারা পরস্পর পরামর্শ করে স্থির করে যে, ইহুদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ কর, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে রেফাআহ্ ও কাতাদার বিরুদ্ধে নালিশ কর এবং তাঁকে অনুরোধ কর তিনি যেন ইহুদীর বিরুদ্ধে আমাদিগকে সমর্থন করেন।

পঞ্চম (অর্থাৎ, ১০৯) আয়াতে বনী-উবায়রাকের সমর্থকদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে তো তোমরা তাদের সমর্থন করলে; কিন্তু ব্যাপার এখানেই শেষ নয়। কেয়ামতে যখন আল্লাহ্র আদালতে মোকদ্দমার শুনানী হবে, তখন কে সমর্থন করবে? এ আয়াতে তাদেরকে একাধারে তিরস্কার করা হয়েছে এবং পরকালের ভীতি প্রদর্শন করে স্বীয় দুষ্কর্মের জন্যে তওবা করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

ষষ্ঠ (অর্থাৎ, ১১০) আয়াতে কোরআন পাকের সাধারণ বিজ্ঞোচিত পদ্ধতি অনুযায়ী অপরাধী-পাপীদেরকে নৈরাশ্য থেকে উদ্ধার করার জন্যে বলা হয়েছে যে, ছোট গোনাহ্ হোক বা বড় গোনাহ্, গোনাহগার ব্যক্তি যখন আল্লাহ্র কাছে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ্কে ক্ষমাশীল করুণাময় পায়। এতেকরে উপরোক্ত গোনাহে যারা জড়িত ছিল, তাদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে যে, এখনও সময় আছে ফিরে এস। খাঁটি মনে তওবা করলে কিছুই নষ্ট হয়নি, আল্লাহ্ তাআলা মাফ করবেন।

সপ্তম (অর্থাৎ, ১১১) আয়াতে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তারা এখনও যদি তওবা না করে, তাহলে তাতে আল্লাহ্র রসূল কিংবা মুসলমানদের কোন ক্ষতি হবে না; বরং এ পাপের বোঝা তাদেরকেই বহন করতে হবে।

অষ্টম (অর্থাৎ, ১১২) আয়াতে একটি সাধারণ বিধির আকারে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি নিজে কোন অপরাধ করে তা অন্য নিরপরাধ ব্যক্তির ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়, (যেমন বর্ণিত ঘটনায় বনী-উবায়রাক নিজে চুরি করে হযরত লবীদ অথবা ইহুদীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিল) সে জঘন্য অপবাদ এবং প্রকাশ্য গোনাহর বোঝা নিজে বহন করে।

নবম (অর্থাৎ, ১১৩) আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ ও কৃপা আপনার সঙ্গী না হলে তাঁরা আপনাকে বিভ্রান্ত করে দিত। তিনি ওহীর মাধ্যমে আপনাকে সত্য ঘটনা বলে দিয়েছেন। আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও কৃপা আপনার সঙ্গী। তাই কখনও তারা আপনাকে বিভ্রান্ত করতে পারে না; বরং নিজেরাই পথভ্রষ্ট হবে। আপনার বিন্দু পরিমাণও ক্ষতি করতে পারে না। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা আপনার প্রতি ঐশীগ্রন্থ এবং জ্ঞানগর্ভ বিষয়াদি অবতারণ করেছেন, যা আপনি ইতিপূর্বে জানতেন না।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ইজতিহাদ করার অধিকার ঃ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ আয়াত থেকে পাঁচটি বিষয় প্রমাণিত হয়। (এক) যেসব বিষয় সম্পর্কে কোরআন পাকে কোন স্পষ্ট উক্তি বর্ণিত নেই সেগুলোতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিজ মতামত দ্বারা ইজতিহাদ করার অধিকার ছিল। জরুরী বিষয়াদিতে তিনি অনেক ফয়সালা স্বীয় ইজতিহাদ দ্বারাও করতেন।

(দুই) আল্লাহ্ তাআলার কাছে সে ইজতিহাদই গ্রহণযোগ্য, যা কোরআন ও সুন্নাহ্র মূলনীতি থেকে গৃহীত। এব্যাপারে নিছক ব্যক্তিগত মতামত ও ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়, শরীয়তের পরিভাষায় একে ইজতিহাদ বলা যায় না।

(তিন) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ইজতিহাদ অন্যান্য মুজতাহিদ ইমামের ইজতিহাদের মত ছিল না, যাতে ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা সর্বদাই বিদ্যমান থাকে। তিনি যখন ইজতিহাদের মাধ্যমে কোন ফাসালা করতেন, তাতে কোন ভুল হয়ে গেলে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে সতর্ক করে ফয়সালাকে নির্ভুল ও সঠিক করিয়ে দিতেন।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কোন ইজতিহাদী ফয়সালার পর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যদি এ সম্পর্কে কোন হুঁশিয়ারী অবতীর্ণ না হত, তবে তাতে

প্রতিভাত হত যে, ফয়সালাটি আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় ও নির্ভুল হয়েছে।

(চার) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোরআন থেকে যাকিছু বুঝতেন, তা ছিল আল্লাহ্ তাআলারই বোঝানো বিষয়। এতে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ ছিল না। অন্যান্য আলেম ও মুজতাহিদের অবস্থা তেমন নয়। তাঁরা যা বোঝেন সে সম্পর্কে একথা বলা যায় না যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁদেরকে বলে দিয়েছেন। আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সম্পর্কে بِمَآ اَرٰىكَ اللّٰهُ বলা হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ আপনাকে যা দেখিয়ে দেন। এ কারণেই فاحكم بما اراك الله (অর্থাৎ, আল্লাহ্ আপনাকে যা দেখিয়ে দেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন)। তখন তিনি শাসিয়ে দিয়ে বললেন ঃ এ বৈশিষ্ট্য একমাত্র রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর, অন্য কারও নয়।

(পাঁচ) মিথ্যা মোকদ্দমা ও মিথ্যা দাবীর তদবীর করা, ওকালতি করা, সমর্থন করা ইত্যাদি সবই হারাম।

তওবার তাৎপর্য ঃ ১১০ তম আয়াত অর্থাৎ وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ থেকে জানা যায় যে, সংক্রামক গোনাহ্ ও অসংক্রামক গোনাহ্, অর্থাৎ বান্দার হকের সাথে কিংবা আল্লাহ্‌র হকের সাথে সম্পর্কযুক্ত সব গোনাহ্‌ই তওবা ও এস্তেগফার দ্বারা মাফ হতে পারে। তবে তওবা ও এস্তেগফারের স্বরূপ জানা জরুরী। শুধু মুখে 'আস্তাগফেরুল্লাহ্ ওয়া আতুবু ইলাইহি' বলার নাম তওবা ও এস্তেগফার নয়। তাই আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তি যদি সেজন্য অনুতপ্ত না হয় এবং তা পরিত্যাগ না করে কিংবা ভবিষ্যতে পরিত্যাগ করতে কৃতসংকল্প না হয়, তবে মুখে মুখে 'আস্তাগফেরুল্লাহ্' বলা তওবার সাথে উপহাস করা বৈ কিছু নয়।

তওবার জন্যে মোটামুটি তিনটি বিষয় জরুরী ঃ (এক) অতীত গোনাহ্‌র জন্যে অনুতপ্ত হওয়া, (দুই) উপস্থিত গোনাহ্ অবিলম্বে ত্যাগ করা এবং (তিন) ভবিষ্যতে গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকতে দৃঢ়সংকল্প হওয়া। বান্দার হকের সাথে যেসব গোনাহ্‌র সম্পর্ক, সেগুলো বান্দার কাছ থেকেই মাফ করিয়ে নেয়া কিংবা হক পরিশোধ করে দেয়া তওবার অন্যতম শর্ত।

নিজের গোনাহ্‌র দোষ অন্যের উপর চাপানো দ্বিগুণ শাস্তির কারণ ঃ ১১২ তম আয়াতে অর্থাৎ, وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ ..... يَرْمِ بِهٖ থেকে জানা যায় যে, যে লোক নিজে পাপ করে এবং অপর নিরপরাধ ব্যক্তিকে সেজন্য অভিযুক্ত করে, সে নিজ গোনাহ্‌কে দ্বিগুণ ও অত্যন্ত কঠোর করে দেয় এবং নির্মম শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়। একে তো নিজের আসল গোনাহ্‌র শাস্তি, দ্বিতীয়তঃ অপবাদের কঠোর শাস্তি।

কোরআন ও সুন্নাহ্‌র তাৎপর্য ঃ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ..... বাক্যে 'কিতাব'-এর সাথে 'হেকমত' শব্দটি উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সুন্নাহ ও শিক্ষার নাম যে 'হেকমত' তাও আল্লাহ্ তাআলারই অবতারিত। পার্থক্য এই যে, সুন্নাহ্‌র শব্দাবলী আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নয়। এ কারণেই কোরআনের অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্য কোরআন ও সুন্নাহ্ উভয়টিরই তথ্যসমূহ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত। তাই উভয়ের বাস্তবায়নই ওয়াজেব।

এ থেকে কোন কোন ফেকাহ্‌বিদের এ উক্তির স্বরূপও জানা গেল যে, ওহী দুই প্রকার ঃ (এক) متلو যা তেলাওয়াত করা হয় এবং (দুই) غير متلو যা তেলাওয়াত করা হয় না। প্রথম প্রকার ওহী কোরআনকে বলা হয়, যার অর্থ ও শব্দাবলী উভয়ই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। দ্বিতীয় প্রকার ওহী হাদীস তথা সুন্নাহ্। এর শব্দাবলী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এবং মর্ম আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জ্ঞান সমগ্র সৃষ্টজীবের চাইতে বেশী ঃ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জ্ঞান আল্লাহ্ তাআলার জ্ঞানের মত সর্বব্যাপী ছিল না; যেমন কতক মূর্খ বলে থাকে। বরং আল্লাহ্ যতটুকু দান করতেন, তিনি তাই পেতেন। তবে এতে বিতর্কের অবকাশ নেই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা সমগ্র সৃষ্টজীবের জ্ঞানের চাইতে অনেক বেশী।

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ
مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ
ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾ وَمَن
يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَ
يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ
جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ
بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ
فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا
إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا ﴿١١٧﴾ لَّعَنَهُ اللَّهُ ۘ
وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿١١٨﴾
وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ
الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ
الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾
يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢٠﴾
أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴿١٢١﴾

(১১৪) তাদের অধিকাংশ সলা-পরামর্শ ভাল নয়; কিন্তু যে সলা-পরামর্শ দান খয়রাত করতে কিংবা সৎকাজ করতে কিংবা মানুষের মধ্যে সন্ধিস্থাপন কল্পে করতো তা স্বতন্ত্র। যে একাজ করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যে আমি তাকে বিরাট ছওয়াব দান করব। (১১৫) যে কেউ রসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফেরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান। (১১৬) নিশ্চয় আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে। এছাড়া যাকে ইচ্ছা, ক্ষমা করেন। যে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে, সে সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হয়। (১১৭) তারা আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করে শুধু নারীর আরাধনা করে এবং শুধু অবাধ্য শয়তানের পূজা করে (১১৮) যার প্রতি আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন। শয়তান বলল ঃ আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করব, (১১৯) তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে আশ্বাস দেব; তাদেরকে পশুদের কর্ণ ছেদন করতে বলব এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেব। যে কেউ আল্লাহ্‌কে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়। (১২০) সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদেরকে আশ্বাস দেয়। শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা সব প্রতারণা বৈ নয়। (১২১) তাদের বাসস্থান জাহান্নাম। তারা সেখান থেকে কোথাও পালাবার জায়গা পাবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পারস্পরিক সলা-পরামর্শ ও মজলিসের উত্তম পন্থা ঃ বলা হয়েছে ঃ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ অর্থাৎ, মানুষের যেসব পারস্পরিক সলা-পরামর্শ পরকালের ভাবনা ও পরিণতির চিন্তা বিবর্জিত শুধু ক্ষণস্থায়ী পার্থিব ও সাময়িক উপকার লাভের জন্য হয়ে থাকে, সেগুলোতে কোন মঙ্গল নেই।

এরপর বলা হয়েছে ঃ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ অর্থাৎ, এসব সলা-পরামর্শ ও কানাকানিতে মঙ্গলের কোন কিছু থাকলে তা হচ্ছে একে অপরকে দান-খয়রাতে উৎসাহিত করা কিংবা সৎকাজের আদেশ দেওয়া অথবা মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শান্তি স্থাপনের পরামর্শ দান করা। এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ মানুষের যেসব কথাবার্তায় আল্লাহ্‌র যিকির কিংবা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ থাকে, সেগুলো ছাড়া সবই তাদের জন্য ক্ষতিকর।

مَعْرُوفٍ এমন কাজকে বলা হয়, যা শরীয়তে প্রশংসিত এবং যা শরীয়তপন্থীদের কাছে পরিচিত। এর বিপরীতে منكر ঐ কাজ, যা শরীয়তে অপছন্দনীয় এবং শরীয়তপন্থীদের কাছে অপরিচিত।

যে কোন সৎকাজের আদেশ এবং উৎসাহদান 'আমর বিল-মারূফে'র অন্তর্ভুক্ত। উৎপীড়িতকে সাহায্য করা, অভাবীদের ঋণ দেয়া, পথভ্রান্তকে পথ বলে দেয়া ইত্যাদি সৎকাজও 'আমর বিল মারূফে'র অন্তর্ভুক্ত। সদকা এবং মানুষের পরস্পরিক শান্তিস্থাপন যদিও এর অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এতদুভয়ের উপকারিতা বহুলোকের মধ্যে বিস্তার লাভ করে এবং জাতীয় জীবন সংশোধিত হয়।

এ ছাড়া দুটি কাজ জনসেবার গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়সমূহকে পরিব্যপ্ত করে। (এক) সৃষ্ট জীবের উপকার করা, (দুই) মানুষকে দুঃখ-কষ্ট থেকে রক্ষা করা। সদকা উপকার সাধনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এবং মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করা, সৃষ্টজীবকে ক্ষতির কবল থেকে রক্ষা করার সর্বপ্রধান মাধ্যম। তাই তফসীরবিদগণ বলেন ঃ এখানে সদকার অর্থ ব্যাপক। ওয়াজেব সদকা, জাকাত, নফল সদকা এবং যে কোন উপকার এর অন্তর্ভুক্ত।

শিরক ও কুফরের শাস্তি চিরস্থায়ী হওয়া ঃ এখানে কেউ কেউ প্রশ্ন করে যে, কর্ম পরিমাণে শাস্তি হওয়া উচিত। মুশরেক ও কাফেররা যে শিরক ও কুফরের অপরাধ করে, তা সীমাবদ্ধ আয়ুষ্কালের মধ্যে করে। অতএব, এর শাস্তি অনন্তকাল স্থায়ী হবে কেন? উত্তর এই যে, কাফের ও মুশরেকেরা কুফর ও শিরককে অপরাধই মনে করে না; বরং পুণ্যের কাজ বলে মনে করে। তাই তাদের ইচ্ছা ও সংকল্প এটাই থাকে যে, চিরকাল এ অবস্থার উপরই কায়েম থাকবে। মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত যখন সে এঅবস্থার উপরই কায়েম থাকে, তখন সে নিজ সাধ্যের সীমা পর্যন্ত চিরস্থায়ী অপরাধ করে নেয়। তাই শাস্তিও চিরস্থায়ী হবে।

জুলুম ও অবিচার তিন প্রকার ঃ এক প্রকার জুলুম আল্লাহ্ তাআলা কখনও ক্ষমা করবেন না। দ্বিতীয় প্রকার জুলুম মাফ হতে পারে। তৃতীয় প্রকার জুলুমের প্রতিশোধ আল্লাহ্ তাআলা না নিয়ে ছাড়বেন না।

প্রথম প্রকার জুলুম হচ্ছে শিরক, দ্বিতীয় প্রকার আল্লাহ্‌র হকে ত্রুটি করা এবং তৃতীয় প্রকার বান্দার হক বিনষ্ট করা।— (ইবনে-কাসীর)

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ وَعْدَ اللّٰهِ
حَقًّا ۭ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ﴿۱۲۲﴾ لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ
وَلَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ ۭ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْۗءًا يُّجْزَ بِهٖ ۙ وَ
لَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿۱۲۳﴾ وَمَنْ يَّعْمَلْ
مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰۗىِٕكَ
يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ﴿۱۲۴﴾ وَمَنْ اَحْسَنُ
دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ
اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۭ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ﴿۱۲۵﴾ وَلِلّٰهِ مَا فِي
السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطًا ﴿۱۲۶﴾
وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَاۗءِ ۭ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ۙ وَمَا
يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ فِيْ يَتٰمَى النِّسَاۗءِ الّٰتِيْ لَا
تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ
وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۙ وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى
بِالْقِسْطِ ۭ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ﴿۱۲۷﴾

(১২২) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আমি তাদেরকে উদ্যানসমূহে প্রবিষ্ট করাব, যেগুলোর তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়। তারা চিরকাল তথায় অবস্থান করবে। আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সত্য সত্য। আল্লাহ্র চাইতে অধিক সত্যবাদী কে? (১২৩) তোমাদের আশার উপরও ভিত্তি নয় এবং আহ্লে-কিতাবদের আশার উপরও না। যে কেউ মন্দ কাজ করবে, সে তার শাস্তি পাবে এবং সে আল্লাহ্ ছাড়া নিজের কোন সমর্থক বা সাহায্যকারী পাবে না। (১২৪) যে লোক পুরুষ হোক কিংবা নারী, কোন সৎকর্ম করে এবং বিশ্বাসী হয়, তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণও নষ্ট হবে না। (১২৫) যে আল্লাহ্র নির্দেশের সামনে মস্তক অবনত করে সৎকাজে নিয়োজিত থাকে এবং ইবরাহীমের ধর্ম অনুসরণ করে— যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন, তার চাইতে উত্তম ধর্ম কার? আল্লাহ্ ইবরাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। (১২৬) যা কিছু নভোমণ্ডলে আছে এবং যা কিছু ভূমণ্ডলে আছে, সব আল্লাহ্রই। সব বস্তু আল্লাহ্র মুষ্ঠি-বলয়ে। (১২৭) তারা আপনার কাছে নারীদের বিবাহের অনুমতি চায়। বলে দিন ঃ আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাদের সম্পর্কে অনুমতি দেন এবং কোরআনে তোমাদেরকে যা যা পাঠ করে শুনানো হয়, তা ঐ সব পিতৃহীনা নারীদের বিধান, যাদেরকে তোমরা নির্ধারিত অধিকার প্রদান কর না অথচ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার বাসনা রাখ। আর অক্ষম শিশুদের বিধান এই যে, এতীমদের জন্যে ইনসাফের উপর কায়েম থাক। তোমরা যা ভাল কাজ করবে, তা আল্লাহ্ জানেন।

শিরকের তাৎপর্য ঃ শিরকের তাৎপর্য হচ্ছে— আল্লাহ্ ব্যতীত কোন সৃষ্টবস্তুকে এবাদত কিংবা মহব্বত ও সম্মান প্রদর্শনে আল্লাহ্র সমতুল্য মনে করা। জাহান্নামে পৌঁছে মুশরেকরা যে উক্তি করবে, কোরআন পাক তা উদ্ধৃত করেছে ঃ تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - অর্থাৎ, আল্লাহ্র কসম, আমরা প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিলাম যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্ব-পালনকর্তার সমতুল্য স্থির করেছিলাম।

জানা কথা যে, মুশরেকদেরও এরূপ বিশ্বাস ছিল না যে, তাদের স্বনির্মিত প্রস্তরমূর্তি বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা ও মালিক। তারা অন্যান্য ভুল-বোঝাবোঝির কারণে এদেরকে এবাদতে কিংবা মহব্বত ও সম্মান প্রদর্শনে আল্লাহ্ তাআলার সমতুল্য স্থির করে নিয়েছিল। এ শিরকই তাদেরকে জাহান্নামে পৌঁছে দিয়েছে। —(ফাতহুল মুলহিম) জানা গেল যে, স্রষ্টা রিযিকদাতা, সর্বশক্তিমান, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহ্ তাআলার ইত্যকার বিশেষ গুণে কোন সৃষ্ট বস্তুকে আল্লাহ্র সমতুল্য মনে করাই শিরক।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ

শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড ঃ لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ - আয়াতে মুসলমান ও আহ্লে-কিতাবদের মধ্যে অনুষ্ঠিত একটি কথোপকথন উল্লেখিত হয়েছে। এরপর এ কথোপকথন বিচার করে উভয় পক্ষকে বিশুদ্ধ হেদায়েতের পর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অবশেষে আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয় ও শ্রেষ্ঠ হওয়ার একটি মানদণ্ড ব্যক্ত করা হয়েছে, যা সামনে রাখলে মানুষ কখনও ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার শিকার হবে না।

হযরত কাতাদাহ (রাঃ) বলেন ঃ একবার কিছু সংখ্যক মুসলমান ও আহ্লে-কিতাবের মধ্যে গর্বসূচক কথাবার্তা শুরু হলে আহ্লে-কিতাবরা বলল ঃ আমরা তোমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ ও সম্ভ্রান্ত। কারণ, আমাদের নবী ও আমাদের গ্রন্থ তোমাদের নবী ও তোমাদের গ্রন্থের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। মুসলমানরা বলল ঃ আমরা তোমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ। কেননা, আমাদের নবী সর্বশেষ নবী এবং আমাদের গ্রন্থ সর্বশেষ গ্রন্থ। এ গ্রন্থ পূর্ববর্তী সব গ্রন্থকে রহিত করে দিয়েছে। এ কথোপকথনের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

এতে বলা হয়েছে যে, এ গর্ব ও অহংকার কারও জন্য শোভা পায় না। শুধু কল্পনা, বাসনা ও দাবী দ্বারা কেউ কারও চাইতে শ্রেষ্ট হয় না, বরং প্রত্যেকের কাজ-কর্মই শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি। কারও নবী ও গ্রন্থ যতই শ্রেষ্ঠ হোক না কেন, যদি সে ভ্রান্ত কাজ করে, তবে সেই কাজের শাস্তি পাবে। এ শাস্তির কবল থেকে রেহাই দিতে পারে— এরূপ কাউকে সে খুঁজে পাবে না।

এ আয়াত অবতীর্ণ হলে সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। ইমাম মুসলিম তিরমিযী, নাসায়ী ও ইমাম আহমদ (রাহঃ) হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, مَنْ يَّعْمَلْ سُوْۗءًا يُّجْزَ بِهٖ - অর্থাৎ, যে কেউ কোন অসৎকাজ করবে, সেজন্যে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হল, তখন আমরা খুব দুঃখিত ও চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়লাম এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) - এর কাছে আরয করলাম যে, এ

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ
وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا
بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ
اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ
اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿١٣١﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٣٢﴾ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ
أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ
قَدِيرًا ﴿١٣٣﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ
ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿١٣٤﴾

(১২৮) যদি কোন নারী স্বীয় স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে, তবে পরস্পর কোন মীমাংসা করে নিলে তাদের উভয়ের কোন গোনাহ্ নাই। মীমাংসা উত্তম। মনের সামনে লোভ বিদ্যমান আছে। যদি তোমরা উত্তম কাজ কর এবং খোদাভীরু হও, তবে, আল্লাহ্ তোমাদের সব কাজের খবর রাখেন। (১২৯) তোমরা কখনও নারীদেরকে সমান রাখতে পারবে না, যদিও এর আকাঙ্ক্ষী হও। অতএব, সম্পূর্ণ ঝুঁকেও পড়ো না যে, একজনকে ফেলে রাখ দোদুল্যমান অবস্থায়। যদি সংশোধন কর এবং খোদাভীরু হও, তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (১৩০) যদি উভয়েই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে আল্লাহ স্বীয় প্রশস্ততা দ্বারা প্রত্যেককে অমুখাপেক্ষী করে দিবেন। আল্লাহ্ সুপ্রশস্ত, প্রজ্ঞাময়। (১৩১) আর যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে সবই আল্লাহ্র। বস্তুতঃ আমি নির্দেশ দিয়েছি তোমাদের পূর্ববর্তী গ্রন্থের অধিকারীদেরকে এবং তোমাদেরকে যে, তোমরা সবাই ভয় করতে থাক আল্লাহকে। যদি তোমরা তা না মান, তবে জেনো, সে সব কিছুই আল্লাহ্ তাআলার যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন অভাবহীন, প্রসংশিত। (১৩২) আর আল্লাহ্রই জন্যে সে সবকিছু যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে। আল্লাহ্ই যথেষ্ট কর্মবিধায়ক। (১৩৩) হে মানবকুল, যদি আল্লাহ্ তোমাদেরকে সরিয়ে তোমাদের জায়গায় অন্য কাউকে প্রতিষ্ঠিত করেন? বস্তুতঃ আল্লাহ্র সে ক্ষমতা রয়েছে। (১৩৪) যে কেউ দুনিয়ার কল্যাণ কামনা করবে, তার জেনে রাখা প্রয়োজন যে, দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ আল্লাহ্রই নিকট রয়েছে। আর আল্লাহ্ সব কিছু শোনেন, দেখেন।

আয়াতটি তো কোন কিছুই ছাড়েনি। সামান্য মন্দ কাজ হলেও তার সাজা দেয়া হবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ চিন্তা করো না, সাধ্যমত কাজ করে যাও। কেননা, (উল্লেখিত শাস্তি যে জাহান্নামই হবে, তা জরুরী নয়) তোমরা দুনিয়াতে যে কোন কষ্ট অথবা বিপদাপদে পড়, তাতে তোমাদের গোনাহ্র কাফ্ফারা এবং মন্দ কাজের শাস্তি হয়ে থাকে। এমন কি যদি কারও পায়ে কাঁটা ফুটে, তাও গোনাহ্র কাফ্ফারা বৈ নয়।

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, মুসলমান দুনিয়াতে যে কোন দুঃখ-কষ্ট, অসুখ-বিসুখ অথবা ভাবনা-চিন্তার সম্মুখীন হয়, তা তার গোনাহ্র কাফ্ফারা হয়ে যায়।

তিরমিযী ও তফসীরে ইবনে-জরীর হযরত আবুবকর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন তাঁদেরকে مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ আয়াতটি শুনালেন, তখন তাঁদের যেন কোমর ভেঙ্গে গেল। এ প্রতিক্রিয়া দেখে তিনি বললেন ঃ ব্যাপার কি? হযরত সিদ্দীক (রাঃ) আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে কোন মন্দ কাজ করেনি? প্রত্যেক কাজেরই যদি প্রতিফল ভোগ করতে হয়, তবে কে রক্ষা পাবে? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ হে আবুবকর! আপনারা মোটেই চিন্তিত হবেন না। কেননা, দুনিয়ার দুঃখ-কষ্টের মাধ্যমে আপনাদের গোনাহ্র কাফ্ফারা হয়ে যাবে।

এক রেওয়ায়েতে আছে, তিনি বললেন ঃ আপনি কি অসুস্থ হন না? আপনি কি কোন দুঃখ ও বিপদে পতিত হন না? হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) আরয করলেন ঃ নিশ্চয় এসব বিষয়ের সম্মুখীন হই। তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ ব্যাস, এটাই আপনাদের প্রতিফল।

আবু দাউদ প্রমুখের বর্ণিত হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর হাদীসে বলা হয়েছে, বান্দা জ্বরে কষ্ট পেলে কিংবা পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হলে তা তাঁর গোনাহ্র কাফ্ফারা হয়ে যায়। এমনকি, যদি কোন ব্যক্তি কোন বস্তু এক পকেটে তালাশ করে অন্য পকেটে পায়, তবে এতটুকু কষ্টও তার গোনাহ্র কাফ্ফারা হয়ে যায়।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছে যে, শুধু দাবী ও বাসনায় লিপ্ত হয়ো না; বরং কাজের চিন্তা কর। কেননা, তোমরা অমুক নবী কিংবা গ্রন্থের অনুসারী—শুধু এ বিষয় দ্বারাই তোমরা সাফল্য অর্জন করতে পারবে না। বরং এ গ্রন্থের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান এবং তদনুযায়ী সৎকার্য সম্পাদনের মধ্যেই প্রকৃত সাফল্য নিহিত রয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে কতিপয় পথনির্দেশ ঃ وَإِنِ امْرَأَةٌ ..... وَاسِعًا حَكِيمًا অত্র তিনটি আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা মানুষের দাম্পত্য জীবনের এমন একটি জটিল দিক সম্পর্কে পথনির্দেশ করেছেন, সুদীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন সময়ে প্রত্যেকটি দম্পতিকেই যার সম্মুখীন হতে হয়। তা হলো স্বামী-স্ত্রীর পারস্পারিক মনোমালিন্য ও মন কষাকষি। আর এটি এমন একটি জটিল সমস্যা, যার সুষ্ঠু সমাধান যথাসময়ে না হলে শুধু স্বামী-স্ত্রীর জীবনই দুর্বিসহ হয় না, বরং অনেক ক্ষেত্রে এহেন পারিবারিক মনোমালিন্যই গোত্র ও বংশগত কলহ-বিবাদ তথা হানাহানি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। কোরআন পাক নর ও নারীর যাবতীয় অনুভূতি ও প্রেরণার প্রতি লক্ষ্য রেখে উভয় শ্রেণীকে এমন এক সার্থক জীবন ব্যবস্থা বাতলে দেয়ার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, যার ফলে মানুষের পারিবারিক

জীবন সুখময় হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এর অনুসরণে পারস্পরিক তিক্ততা ও মর্ম-পীড়া, ভালবাসা ও প্রশান্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আর যদি অনিবার্য কারণে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হয়, তবে তা করা হবে সম্মানজনক ও সৌজন্যমূলক পন্থায় যেন, তার পেছনে শত্রুতা, বিদ্বেষ বা উৎপীড়নের মনোভাব না থাকে।

১২৮ তম আয়াতটি এমনি সমস্যা সম্পর্কিত, যাতে অনিচ্ছাকৃতভাবে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টি হয়। নিজ নিজ হিসাবে উভয়ে নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও পারস্পরিক মনের মিল না হওয়ার কারণে উভয়ে নিজ নিজ ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা করে। যেমন, একজন সুদর্শন সুঠামদেহী স্বামীর স্ত্রী স্বাস্থ্যহীনা, অধিক বয়স্কা অথবা সুশ্রী না হওয়ার কারণে তার প্রতি স্বামীর মন আকৃষ্ট হচ্ছে না। আর এর প্রতিকার করাও স্ত্রীর সাধ্যাতীত। এমতাবস্থায় স্ত্রীকেও দোষারোপ করা যায় না, অন্যদিকে স্বামীকেও নিরপরাধ সাব্যস্ত করা যায়।

অত্র আয়াতের শানে নুযুল প্রসঙ্গে এ ধরনের কতিপয় ঘটনা তফসীরে-মাযহারী প্রভৃতি কিতাবে বর্ণিত রয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে কোরআন পাকের সাধারণ নীতি فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ – অর্থাৎ, উক্ত স্ত্রীকে বহাল রাখতে চাইলে তার যাবতীয় ন্যায্য অধিকার ও চাহিদা পূরণ করে রাখতে হবে। আর তা যদি সম্ভব না হয়, তবে কল্যাণকর ও সৌজন্যমূলক পন্থায় তাকে বিদায় করবে। এমতাবস্থায় স্ত্রীও যদি বিবাহ বিচ্ছেদে সম্মত হয়, তবে ভদ্রতা ও শালীনতার সাথেই বিচ্ছেদ সম্পন্ন হবে। পক্ষান্তরে স্ত্রী যদি তার সন্তানের খাতিরে অথবা নিজের অন্য কোন আশ্রয় না থাকার কারণে, বিবাহ বিচ্ছেদে অসম্মত হয়, তবে তার জন্য সঠিক পন্থা এই যে, নিজের প্রাপ্য মোহর বা খোর-পোষের ন্যায্য দাবী আংশিক বা পুরোপুরি প্রত্যাহার করে স্বামীকে বিবাহ বন্ধন অটুট রাখার জন্য সম্মত করাবে। দায়দায়িত্ব ও ব্যয় ভার লাঘব হওয়ার কারণে স্বামীও হয়ত এ সমস্ত অধিকার থেকে মুক্ত হতে পেরে এ প্রস্তাব অনুমোদন করবে। এভাবে সমঝোতা হয়ে যেতে পারে।

কোরআন করীমের অত্র আয়াতে এ ধরনের সমঝোতার সম্ভাব্যতার প্রতি পথ নির্দেশ করতে গিয়ে বলা হয়েছে وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ অর্থাৎ, "প্রত্যেক অন্তরেই লোভ বিদ্যমান রয়েছে।" কাজেই স্ত্রী হয়ত মনে করবে যে, আমাকে বিদায় করে দিলে সন্তানাদির জীবন বরবাদ হবে, অথবা অন্যত্র আমার জীবন আরো দুর্বিসহ হতে পারে। তার চেয়ে বরং এখানে কিছু ত্যাগ স্বীকার করে পড়ে থাকাই লাভজনক। স্বামী হয়ত মনে করবে যে, দায়-দায়িত্ব হতে যখন অনেকটা রেহাই পাওয়া গেল, তখন তাকে বিবাহ বন্ধনে রাখতে ক্ষতি কি? অতএব, এভাবে অনায়াসে সমঝোতা হতে পারে। সাথে সাথে এরশাদ করা হয়েছে ঃ-

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا

'যদি কোন নারী স্বামীর পক্ষ থেকে কলহ-বিবাদ বা বিমুখ হওয়ার আশঙ্কা বোধ করে, তবে উভয়ের কারোই কোন গোনাহ্ হবে না, যদি তারা নিজেদের মধ্যে শর্ত সাপেক্ষে পারস্পরিক সমোঝতায় উপনীত হয়। এখানে গোনাহ্ না হওয়ার কথা বলার কারণ এই যে, ব্যাপারটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে ঘুষের আদান-প্রদানের মত মনে হয়। কারণ, স্বামীকে মোহরানা ইত্যাদি ন্যায্য দাবী হতে অব্যাহতির প্রলোভন দিয়ে দাম্পত্য বন্ধন অটুট রাখা হয়েছে। কিন্তু কোরআন পাকের এ ভাষ্যের দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, বস্তুতঃ এটা ঘুষের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং উভয় পক্ষ কিছু কিছু স্বার্থ ত্যাগ করে মধ্যপন্থা অবলম্বন ও সমঝোতার ব্যাপার। অতএব, এটা সম্পূর্ণ জায়েয।

দাম্পত্য কলহের মধ্যে অযথা অন্যের হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয় ঃ তফসীরে মাযহারীতে বর্ণিত আছে যে, أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا অর্থাৎ, স্বামী-স্ত্রী নিজেদের মধ্যে কোন সমঝোতা করে নেবে। এখানে بَيْنَهُمَا পদ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া-কলহ বা সন্ধি -সমঝোতার মধ্যে অহেতুক কোন তৃতীয় ব্যক্তি নাক গলাবে না। বরং তাদের নিজেদেরকে সমঝোতায় উপনীত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। কারণ, তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতির ফলে স্বামী-স্ত্রীর দোষ-ত্রুটি অন্য লোকের গোচরীভূত হয়, যা তাদের উভয়ের জন্যই লজ্জাকর ও স্বার্থের পরিপন্থী। তদুপরি তৃতীয় পক্ষের কারণে সন্ধি-সমঝোতা দুষ্কর হয়ে পড়াও বিচিত্র নয়। অত্র আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেন— وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

অর্থাৎ "আর যদি তোমরা কল্যাণ সাধন কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে অবশ্যই আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের কার্য-কলাপ সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন।" এখানে বুঝানো হয়েছে যে, অনিবার্য কারণ বশতঃ স্বামীর অন্তরে যদি স্ত্রীর প্রতি কোন আকর্ষণ না থাকে এবং তার ন্যায্য অধিকার পূরণ করা অসম্ভব মনে করে তাকে বিদায় করতে চায়, তবে আইনের দৃষ্টিতে স্বামীকে সে অধিকার দেয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় স্ত্রীর পক্ষ থেকে কিছুটা স্বার্থ পরিত্যাগ করে সমঝোতা করাও জায়েয। কিন্তু এতদসত্ত্বেও স্বামী যদি সংযম ও খোদাভীতির পরিচয় দেয়, স্ত্রীর সাথে সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করে, মনের মিল না হওয়া সত্ত্বেও তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ না করে বরং তার যাবতীয় অধিকার ও প্রয়োজন পূরণ করে, তবে তার এই ত্যাগ ও উদারতা সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা ওয়াকিফহাল রয়েছেন। অতএব, তিনি এহেন ধৈর্য, উদারতা, সহনশীলতা ও মহানুভবতার এমন প্রতিদান দেবেন, যা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। এখানে "আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের কার্য-কলাপ সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন" বলেই ক্ষান্ত করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিদান কি দেবেন, তা উল্লেখ করা হয়নি। কারণ, এর প্রতিদান হবে কল্পনার উর্ধ্বে, ধারণার অতীত।

মোটকথা, কোরআন পাক উভয় পক্ষকে একদিকে স্বীয় অভাব-অভিযোগ দূর করা ও ন্যায্য অধিকার লাভ করার আইনতঃ অধিকার দিয়েছে। অপর দিকে ত্যাগ, ধৈর্য, সংযম ও উন্নত চরিত্র অবলম্বন করার উপদেশ দিয়েছে। এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, বিবাহবিচ্ছেদ হতে যথাসাধ্য বিরত থাকা কর্তব্য। বরং উভয়ের পক্ষেই কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করে সমঝোতায় আসা বাঞ্ছনীয়।

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ অর্থাৎ, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্ তাআলার। এখানে এই উক্তিটির তিন বার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। প্রথমবার বোঝানো হয়েছে আল্লাহ্র সচ্ছলতা, প্রাচুর্য ও তাঁর দরবারে অভাবহীনতা। দ্বিতীয়বার বোঝানো হয়েছে যে, কারো অবাধ্যতায় আল্লাহ্ তাআলার কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। তৃতীয়বার আল্লাহ্ পাকের অপার রহমত ও সহায়তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমরা যদি খোদাভীতি ও আনুগত্য করো, তবে তিনি তোমাদের সর্ব কাজে সহায়তা করবেন, রহমত বর্ষণ করবেন, এবং অনায়াসে

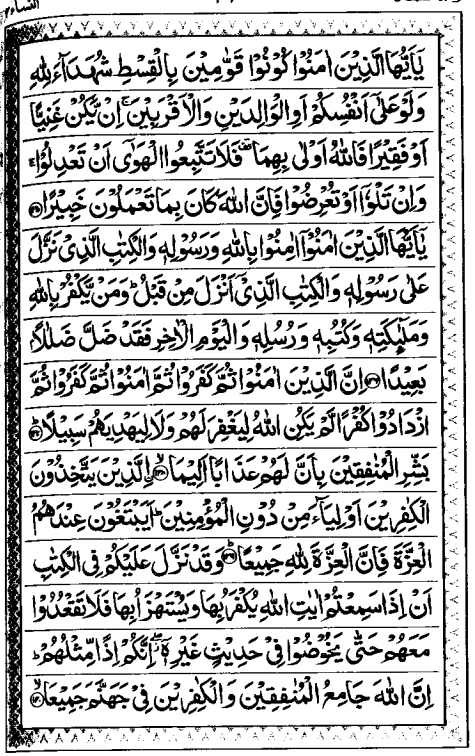

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ
وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا
اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۣ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ
وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝
يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ
عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۭ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ
وَمَلٰۗىِٕكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًۢا
بَعِيْدًا ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ
ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا ۝
بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمَا ۝ الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ
الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاۗءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۭ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ
الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۝ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ
اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا
مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖٓ ۚ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ۭ
اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعَۨا ۝

(১৩৫) হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক; আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্যদান কর, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা- মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবুও। কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ্ তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী তোমাদের চাইতে বেশী। অতএব, তোমরা বিচার করতে গিয়ে রিপুর কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ্ তোমাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম সম্পর্কেই অবগত। (১৩৬) হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্‌র উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর এবং বিশ্বাস স্থাপন কর তাঁর রসূল ও তাঁর কিতাবের উপর, যা তিনি নাযিল করেছেন স্বীয় রসূলের উপর এবং সেসমস্ত কিতাবের উপর, যেগুলো নাযিল করা হয়েছিল ইতিপূর্বে। যে আল্লাহ্‌র উপর, তাঁর ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং রসূলগণের উপর ও কিয়ামতদিনের উপর বিশ্বাস করবে না, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে গিয়ে পড়বে (১৩৭) যারা একবার মুসলমান হয়ে পরে পুনরায় কাফের হয়ে গেছে, আবার মুসলমান হয়েছে এবং আবারো কাফের হয়েছে এবং কুফরীতেই উন্নতি লাভ করেছে, আল্লাহ্ তাদেরকে না কখনও ক্ষমা করবেন, না পথ দেখাবেন। (১৩৮) সেসব মুনাফেককে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব— (১৩৯) যারা মুসলমানদের বর্জন করে কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নেয় এবং তাদেরই কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে, অথচ যাবতীয় সম্মান শুধুমাত্র আল্লাহ্‌রই জন্য। (১৪০) আর কোরআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই হুকুম জারি করে দিয়েছেন যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতিজ্ঞাপন ও বিদ্রূপ হতে শুনবে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। তা না হলে তোমরাও তাদেরই মত হয়ে যাবে। আল্লাহ্ দোযখের মাঝে মুনাফেক ও কাফেরদেরকে একই জায়গায় সমবেত করবেন।

সু-সম্পন্ন করে দেবেন।

তৃতীয় আয়াতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা অপরিসীম ক্ষমতাবান। তিনি ইচ্ছা করলে এক মুহূর্তে সব কিছু পরিবর্তন করে দিতে পারেন। তোমাদের সবাইকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে তোমাদের স্থলে অন্যদেরকে অধিষ্ঠিত করতে সক্ষম। অবাধ্যদের পরিবর্তে তিনি অনুগত ও বাধ্য লোক অনায়াসে সৃষ্টি করতে পারেন। এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও অনির্ভরতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে এবং অবাধ্যদেরকে ভীত প্রদর্শন করা হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

দুনিয়ার বুকে নবী প্রেরণ ও কিতাব নাযিলের উদ্দেশ্য ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা এবং এটাই বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার চাবিকাঠি।

সূরা-নিসার এই আয়াতে সব মুসলমানকে ইনসাফ ও ন্যায়নিষ্ঠার উপর অটল থাকতে এবং সত্য সাক্ষ্যদান করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতাসমূহও স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। একই বিষয় প্রসঙ্গে সূরা মায়েদা ও সূরা হাদীদে দু'খানি আয়াত রয়েছে। সূরা মায়েদার আয়াতের বিষয়বস্তু এমনকি শব্দাবলীও প্রায় অভিন্ন। সূরা হাদীদের আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, হযরত আদম (আঃ)-কে প্রতিনিধিরূপে দুনিয়ায় পাঠানো, অতঃপর একের পর এক নবী প্রেরণ এবং শতাধিক ছহীফা ও আসমানী কিতাব নাযিল করার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়ার বুকে শান্তি-শৃঙ্খলা এবং ইনসাফ ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ ক্ষমতার গণ্ডির মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির উপর অবিচল থাকে। শিক্ষা-দীক্ষা, ওয়াজ-নছিহত, তালিম ও তরবিয়তের মাধ্যমে যেসব অবাধ্য লোককে সত্য ও ন্যায়ের পথে আনা যাবে না, তাদেরকে প্রশাসনিক আইন অনুসারে উপযুক্ত শাস্তি দান করে সৎপথে আসতে বাধ্য করা হবে।

কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা ও তার উপর অবিচল থাকা শুধু সরকার ও বিচার বিভাগেরই বিশেষ দায়িত্ব নয়, বরং প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন সে নিজে ন্যায়নীতির উপর স্থির থাকে এবং অন্যেকেও ইনসাফ ও ন্যায়নীতির উপর অবিচল রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। অবশ্য ইনসাফ ও ন্যায়নীতির একটি পর্যায় সরকার ও শাসন কর্তৃপক্ষের বিশেষ দায়িত্ব। তা হচ্ছে দুষ্ট ও অবাধ্য লোকেরা যখন ন্যায়নীতিকে পদদলিত করবে নিজেরা তো ন্যায়-নীতির ধার ধারবেই না, বরং অন্যকেও ন্যায়নীতির উপর স্থির থাকতে দেবে না; তখন তাদেরকে দমন করার জন্য আইনের শাসন ও উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। এমতাবস্থায় একমাত্র ক্ষমতাসীন সরকার ও কর্তৃপক্ষই ইনসাফ ও ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

বর্তমান বিশ্বের মূর্খ জনগণ তো দূরের কথা, শিক্ষিত সুধীরাও মনে করেন যে, ইনসাফ ও ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা করা শুধু সরকার ও আদালতেরই দায়িত্ব; এ ব্যাপারে জনগণের কোন দায়-দায়িত্ব নেই। এহেন ভ্রান্ত ধারণার কারণেই বিশ্বের সব দেশে সব রাজ্যে সরকার ও জনগণ দু'টি পরস্পর বিরোধী শক্তিতে বিভক্ত হয়ে গেছে। শাসক ও শাসিতের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। সব দেশের জনগণ সরকারের কাছে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি দাবী করে, কিন্তু নিজেরা কখনো ন্যায়-নীতি পালন করতে প্রস্তুত নয়। এরই কুফল আজ সারা বিশ্বকে গ্রাস করেছে। আইন

–কানুন নিষ্ক্রিয় ও অপরাধ প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। আজকাল সব দেশেই আইন প্রণয়নের জন্য সংসদ রয়েছে। এখানে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। আর তার সদস্য মনোনয়নের জন্য অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সারা দুনিয়ায় হৈ চৈ পড়ে যাচ্ছে। অতঃপর নির্বাচিত সদস্যগণ দেশবাসীর মন–মানসিকতা, আবেগ–অনুভূতি ও দেশের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আইন প্রণয়ন করছেন। তারপর জনমত যাচাই করার জন্য তার প্রকাশ ও প্রচার করা হয় এবং জনসমর্থন লাভের পর তা প্রবর্তন করা হয়। আর সেটা কার্যকরী করার জন্য সরকারের প্রশাসনযন্ত্র সচল হয়ে উঠে যার অসংখ্য শাখা–প্রশাখা সারা দেশে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রত্যেক শাখার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন দেশের সুদক্ষ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ। দেশের শান্তিশৃঙ্খলা, কল্যাণ ও নিরাপত্তার জন্য তার সক্রিয় কর্মতৎপরতা প্রদর্শন করছেন। কিন্তু এত বিপুল আয়োজন সত্ত্বেও প্রচলিত তন্ত্র–মন্ত্রের মোহমুক্ত হয়ে, তথাকথিত সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঠিকাদারদের অন্ধ অনুকরণের উর্ধ্বে উঠে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে প্রত্যেকেই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, ফলাফল অত্যন্ত নৈরাস্যজনক।

খোদাভীতি ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসই বিশ্ব শান্তির চাবিকাঠি ঃ সুস্থ বিবেকসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তি চলমান সমাজের প্রথা ও রীতিনীতির বন্ধন ছিন্ন করে, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে রসূলে আরাবী (সাঃ)–এর আনীত পয়গাম সম্পর্কে চিন্তা করলে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন যে, শুধু আইন ও দণ্ডদান করেই পৃথিবীতে কখনো শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জিত হয়নি বরং ভবিষ্যতেও অর্জিত হবে না। একমাত্র খোদাভীতি ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসই বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারে। যার ফলে রাজা–প্রজা, শাসক ও শাসিত সর্বপ্রকার দায়–দায়িত্ব উপলব্ধি করতে, তা যথাযথভাবে পালন করতে সচেষ্ট হয়। আইনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে জনসাধারণ একথা বলে দায়িত্ব এড়াতে পারে না যে, এটা সরকারের কাজ। কোরআন–মজীদের পূর্বোল্লিখিত আয়াতসমূহে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এক বৈপ্লবিক বিশ্বাসের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শেষ করা হয়েছে।

উপরোক্ত আয়াতত্রয়ের মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির উপর অটল–অনড় থাকা এবং অন্যকেও অটল রাখার চেষ্টা করার জন্য শাসক–শাসিত নির্বিশেষে সবাইকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর আয়াতসমূহের শেষ দিকে এমন এক তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যা মানুষের ধ্যান–ধারণা ও প্রেরণার জগতে মহা–বিপ্লবের সূচনা করতে পারে। তা হলো, আল্লাহ্ তাআলার অপরিসীম ক্ষমতা ও পরাক্রম, তার সম্মুখে উপস্থিতি ও জাবাবদিহী এবং প্রতিদান ও প্রতিফল লাভের বিশ্বাস। এটা এমন এক সম্পদ যার দৌলতে আজ থেকে সাতশত বছর পূর্ববর্তি অশিক্ষিত বিশ্বাসী লোকেরাও বিপুল শান্তি ও নিরপত্তা ভোগ করতো এবং যার অভাবের কারণেই আজকের মহাশূন্যের অভিযাত্রী, কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণকারী উন্নত বিশ্ববাসীরা শান্তি ও নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত।

আধুনিক জ্ঞান–বিজ্ঞানের পূজারী ও তন্ত্র–মন্ত্রের অন্ধ অনুসারীদের উপলব্ধি করা উচিত যে, বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতির ফলে তারা হয়তো মহাশূন্যে আরোহণ করতে, গ্রহ হতে গ্রহান্তরে ভেসে বেড়াতে এবং মহাসাগর পাড়ি দিতে পারবে, কিন্তু সমস্ত জ্ঞান–বিজ্ঞান, শিল্প–কারখানা, উপাদান–উপকরণ প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থাৎ, সুখ–শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা কোথাও পাবে না। কোন অত্যাধুনিক আবিষ্কারের মাঝে কিংবা কোন গ্রহ–উপগ্রহেই তা খুঁজে পাওয়া যাবে না। বরং পাওয়া যাবে একমাত্র রসূলে আরাবী (সাঃ)–এর পয়গাম ও শিক্ষার মধ্যে, খোদাভীতি ও আখেরাতের বিশ্বাসের মধ্যে। এরশাদ হয়েছে– أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ অর্থাৎ, মনে রেখো, একমাত্র আল্লাহ্র স্মরণের মধ্যেই অন্তরসমূহের প্রশান্তি নিহিত। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কারসমূহ বস্তুতঃপক্ষে আল্লাহ্ তাআলার অফুরন্ত কুদরত ও কল্পনাতীত সৃষ্টি বৈচিত্র্যকে ভাস্বর করে চলেছে, যার সামনে মানুষ তার অক্ষমতা ও অযোগ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য। কিন্তু অনুভূতিশীল অন্তর ও অর্ন্তদৃষ্টিসম্পন্ন চোখ না হলে তাতেই বা কি লাভ।

কোরআন হাকীম একদিকে পৃথিবীতে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিধি–বিধানের ব্যবস্থা করেছে, অপরদিকে এমন এক অপূর্ব নীতিমালা ঘোষণা করেছে– যাকে পুরোপুরি গ্রহণ ও নিষ্ঠার সাথে বাস্তবায়ন করা হলে, যুলুম ও অনাচারে জর্জরিত দুনিয়া সুখ–শান্তির আধারে পরিণত হবে। আখেরাতে বেহেশত লাভের পূর্বে দুনিয়াতেই জান্নাতী সুখের নমুনা উপভোগ করা যাবে।

..... إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا – কারো মতে অত্র আয়াতে মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। আর অনেকের মতে আয়াতটিতে ইহুদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। কেননা, প্রথমে তারা হযরত মূসা (আঃ)–এর প্রতি ঈমান এনেছিল তারপর গো–বৎসের পূজা করে কাফের হয়েছিল, অতঃপর তওবা করে আবার ঈমান এনেছিল, পুনরায় হযরত ঈসা (আঃ)– কে অস্বীকার করে কুফরীর চরমে উপনীত হয়েছে। – (তফসীর রুহুল মা'আনী)

لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا এ আয়াতের তাৎপর্য এই যে, বার বার কুফরীর মধ্যে লিপ্ত হওয়ার ফলে সত্যকে উপলব্ধি করার এবং গ্রহণ করার যোগ্যতা রহিত হয়ে যায়। ভবিষ্যতে তওবা করা ও ঈমান আনার সৌভাগ্য হয় না। তবে কোরআন–হাদীসের অকাট্য দলীলাদির দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, যত বড় কট্টর কাফের বা মোরতাদই হোক না কেন, যদি সত্যিকারভাবে তওবা করে, তবে পূর্বের সমুদয় গোনাহ মাফ হয়ে যায়। অতএব, বার বার কুফরী করার পরও যদি তারা সত্যিকারভাবে তওবা করে, তবে তাদের জন্য এখনো ক্ষমার দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে।

এখানে প্রথম আয়াতে মুনাফেকদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তির হুঁশিয়ারী দেওয়া হয়েছে। তবে এহেন দুঃসংবাদকে بشارت অর্থাৎ, 'সু–সংবাদ' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নিজের ভবিষ্যত সম্পর্কে কোন সু–সংবাদ শুনার জন্য প্রত্যেকেই উদ্গ্রীব থাকে। কিন্তু মুনাফেকদের জন্য এছাড়া আর কোন সংবাদ নেই। বরং তাদের জন্য সু–সংবাদের পরিবর্তে এটাই একমাত্র ভবিষ্যদ্বাণী।

মানমর্যাদা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার সমীপে কামনা করা বাঞ্ছনীয় ঃ দ্বিতীয় আয়াতে কাফের ও মুশরেকদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্য স্থাপন করাকে নিষিদ্ধ করে এধরনের আচরণে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। সাথে সাথে এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার উৎস ও মূল কারণ বর্ণনা করতঃ একেও অযথা–অবান্তর প্রক্রিয়া করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন – أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا অর্থাৎ, "তারা কি ওদের কাছে গিয়ে ইজ্জত–সম্মান লাভ করতে চায়? তবে ইজ্জত–সম্মান তো সম্পূর্ণ আল্লাহ্ তাআলার এখতিয়ারাধীন।"

কাফের ও মুশরেকদের সাথে সৌহার্দ্য ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখা এবং অবাধ মেলা-মেশার প্রধান কারণ এই যে, ওদের বাহ্যিক মান-মর্যাদা, বুদ্ধি-সামর্থ্য, ধনবলে-প্রভাবিত হয়ে হীনমন্যতার শিকার হয় এবং মনে করে যে, ওদের সাহায্য-সহযোগিতায় আমাদেরও মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ্ তাআলা তাদের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করে বলেন যে, তারা এমন লোকদের সাহায্যে মর্যাদাবান হওয়ার আকাঙ্খা করছে, যাদের নিজেদেরই প্রকৃতপক্ষে কোন মর্যাদা নেই। তাছাড়া যে শক্তি ও বিজয়ের মধ্যে প্রকৃত ইজ্জত ও সম্মান নিহিত, তাতো একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার এখতিয়ারভুক্ত। অন্য কারো মধ্যে যখন কোন ক্ষমতা বা সাফল্য পরিদৃষ্ট হয়, তা সবই আল্লাহ্ প্রদত্ত। অতএব, মান-মর্যাদা দানকারী মালিককে অসন্তুষ্ট করে তাঁর শত্রুদের থেকে ইজ্জত হাসিল করার অপচেষ্টা কত বড় বোকামী!

এ সম্পর্কে 'সূরায়ে-মুনাফেকূন' – এ এরশাদ হয়েছে ঃ

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ, ইজ্জত-সম্মান একমাত্র আল্লাহ্, রসূল এবং ঈমানদারদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু মুনাফেকরা তা অবগত নয়।

এখানে আল্লাহ্ তাআলার সাথে হযরত রসূল (সাঃ) ও মুমিনদের উল্লেখ করে বোঝানো হয়েছে যে, ইজ্জতের মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তাআলা। তিনি যাকে ইচ্ছা আংশিক মার্যাদা দান করেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও মুমিনগণ যেহেতু আল্লাহ্ তাআলার একান্ত অনুগত, পছন্দনীয় ও প্রিয়পাত্র, তাই তিনি তাঁদেরকে সম্মান দান করেন। পক্ষান্তরে কাফের ও মুশরেকদের ভাগ্যে সত্যিকার কোন ইজ্জত নেই। অতএব, তাদের সাথে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক স্থাপন করে সম্মান অর্জন করা সুদুর পরাহত। ফারুকে-আযম হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বান্দাদের (মখলুকের) সাহায্যে মর্যাদাবান হওয়ার বাসনা করে আল্লাহ্ তাআলা তাকে লাঞ্ছিত করেন।

হযরত আবুবকর জাস্সাস (রাহঃ) 'অহ্কামুল – কোরআনে' লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের মর্ম এই যে, কাফের, মুশরেক পাপিষ্ঠ ও পথভ্রষ্টদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে মর্যাদা ও প্রতিপত্তি অর্জনের ব্যর্থ চেষ্টা করা অন্যায় ও অপরাধ। তবে এই উদ্দেশে মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন নিষেধ করা হয় নাই। কেননা, সূরা মুনাফেকূনের পূর্বোক্ত আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় রসূলকে (সাঃ) ও মুমিনদেরকে ইজ্জত দান করেছেন।

এখানে মর্যাদার অর্থ যদি আখেরাতের চিরস্থায়ী ইজ্জত-সম্মান হয়, তবে তা আল্লাহ্ তাআলা শুধুমাত্র তাঁর রসূল (সাঃ) ও মুমিনদের জন্য সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। কারণ, আখেরাতের আরাম-আয়েশ, ইজ্জত-সম্মান কোন কাফের বা মুশরেক কস্মিনকালেও লাভ করবে না। আর যদি এখানে পার্থিব মান-মর্যাদা ধরা হয়, তবে মুসলমানরা যতদিন সত্যিকার মুমিন থাকবে, ততদিন সম্মান ও প্রতিপত্তি তাদেরই করায়ত্ত থাকবে। অবশ্য তাদের ঈমানের দুর্বলতা, আমলের গাফলতি বা পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার কারণে তাদের সাময়িক ভাগ্যবিপর্যয় হলে বা ঘটনাচক্রে অসহায় হতমান হলেও পরিশেষে তারাই আবার মর্যাদা ও বিজয়ের গৌরব লাভ করবে। দুনিয়ার ইতিহাসে এর বহু নজীর রয়েছে। শেষ যুগে হযরত ঈসা (আঃ) ও ইমাম মাহ্দীর নেতৃত্বে মুসলমানরা আবার যখন সত্যিকার ইসলামের অনুসারী হবে, তখন তারাই দুনিয়ার একচ্ছত্র ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী হবে।

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ —— অত্র আয়াতে ইতিপূর্বে মক্কা মোকাররমায় অবতীর্ণ সুরা আন্‌আমের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে বলা হয়েছে,— আমি তো মানুষের সংশোধনের নিমিত্ত আগেই হুকুম নাযিল করেছিলাম যে, কাফের ও বদকারের ধারে কাছেও বসবে না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার যে, কপটাচারী মুনাফেকরা আদেশ লঙ্ঘন করে ওদের সাথে সৌহার্দ্য স্থাপন করতে শুরু করেছে এবং তাদেরকে ইজ্জত-সম্মানের মালিক মোখতার মনে করেছে।

সূরায়ে-নেসার আলোচ্য আয়াত এবং সূরায়ে আন্‌আমের যে আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, এতদুভয়ের সমন্বিত মর্ম এই যে, যদি কোন প্রভাবে কতিপয় লোক একত্রিত হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার কোন আয়াত বা হুকুমকে অস্বীকার বা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে থাকে, তবে যতক্ষণ তারা এহেন গর্হিত ও অবাঞ্ছিত কার্যে লিপ্ত থাকবে, ততক্ষণ তাদের মজলিসে বসা বা যোগদান করা মুসলমানদের জন্যে হারাম।

মোটকথা, বাতিল পন্থীদের মজলিসে উপস্থিতি ও তার হুকুম কয়েক প্রকার। প্রথমতঃ তাদের কুফরী চিন্তাধারার প্রতি সম্মতি ও সন্তুষ্টি সহকারে যোগদান করা। এটা মারাত্মক অপরাধ ও কুফরী। দ্বিতীয়তঃ গর্হিত আলোচনা চলাকালে বিনা প্রয়োজনে অপছন্দ সহকারে উপবেশন করা। এটা অত্যন্ত অন্যায় ও ফাসেকী। তৃতীয়তঃ পার্থিব প্রয়োজনবশতঃ বিরক্তি সহকারে বসা জায়েয। চতুর্থতঃ জোর-জবরদস্তির কারণে বাধ্য হয়ে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে বসা ক্ষমার্হ। পঞ্চমতঃ তাদেরকে সৎপথে আনয়নের উদ্দেশে উপস্থিত হওয়া সওয়াবের কাজ।

কুফরীর প্রতি মৌন সম্মতিও কুফরী ঃ আলোচ্য আয়াতের শেষে এরশাদ হয়েছে— إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ অর্থাৎ, এমন মজলিস যেখানে আল্লাহ্ তা'আলার আয়াত ও আহ্কামকে অস্বীকার, বিদ্রূপ বা বিকৃত করা হয়, সেখানে হৃষ্টচিত্তে উপবেশন করলে তোমরাও তাদের সমতুল্য ও তাদের গোনাহ্র অংশীদার হবে। অর্থাৎ, খোদা না করুন, তোমরা যদি তাদের সমতুল্য ও তাদের গোনাহ্র অংশীদার হবে। অর্থাৎ, খোদা না করুন, তোমরা যদি তাদের কুফরী কথাবার্তা মনে-প্রাণে পছন্দ কর, তাহলে বস্তুতঃ তোমরাও কাফের হয়ে যাবে। কেননা, কুফরীকে পছন্দ করাও কুফরী। আর যদি তাদের কথাবার্তা পছন্দ না করা সত্ত্বেও বিনা প্রয়োজনে তাদের সাথে উঠা বসা কর এমতাবস্থায়ে তাদের সমতুল্য হওয়ার অর্থ হবে তারা যেভাবে শরীয়তকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি সাধন করার অপ্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে, তোমরা তাদের আসরে যোগদান করে সহযোগিতা করায় তাদের মতই ইসলামের ক্ষতি সাধন করছ ! নাউজু বিল্লাহে মিন যালেকা।

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا
أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ
نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾
إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا
إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ
اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾ مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا
إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿١٤٣﴾ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿١٤٤﴾
إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ
لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ
وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ
اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٤٦﴾ مَّا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ
إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿١٤٧﴾

(১৪১) এরা এমনি মুনাফেক যারা তোমাদের কল্যাণ-অকল্যাণের প্রতীক্ষায় ওঁৎপেতে থাকে। অতঃপর আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তোমাদের যদি কোন বিজয় অর্জিত হয়, তবে তারা বলে, আমরাও কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? পক্ষান্তরে কাফেরদের যদি আংশিক বিজয় হয়, তবে বলে, আমরা কি তোমাদেরকে ঘিরে রাখিনি এবং মুসলমানদের কবল থেকে রক্ষা করিনি? সুতরাং আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কেয়ামতের দিন মীমাংসা করবেন এবং কিছুতেই আল্লাহ্ কাফেরদেরকে মুসলমানদের উপর বিজয় দান করবেন না।

(১৪২) অবশ্যই মুনাফেকরা প্রতারণা করছে আল্লাহ্‌র সাথে, অথচ তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতারিত করে। বস্তুতঃ তারা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন দাঁড়ায়, একান্ত শিথিলভাবে লোক দেখানোর জন্য। আর তারা আল্লাহ্‌কে অল্পই স্মরণ করে। (১৪৩) এরা দোদুল্যমান অবস্থায় ঝুলন্ত; এদিকেও নয় ওদিকেও নয়। বস্তুতঃ যাকে আল্লাহ্ গোমরাহ্ করে দেন, তুমি তাদের জন্য কোন পথই পাবে না কোথাও। (১৪৪) হে ঈমানদারগণ! তোমরা কাফেরদেরকে বন্ধু বানিও না মুসলমানদের বাদ দিয়ে। তোমরা কি এমনটি করে নিজের উপর আল্লাহ্‌র প্রাকাশ্য দলীল কায়েম করে দেবে? (১৪৫) নিঃসন্দেহে মুনাফেকরা রয়েছে দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে। আর তোমরা তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী কখনও পাবে না। (১৪৬) অবশ্য যারা তওবা করে নিয়েছে, নিজেদের অবস্থার সংস্কার করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে আল্লাহর ফরমাবরদার হয়েছে, তারা থাকবে মুসলমানদেরই সাথে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ শীঘ্রই ঈমানদারগণকে মহাপুণ্য দান করবেন। (১৪৭) তোমাদের আযাব দিয়ে আল্লাহ্ কি করবেন যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক! আর আল্লাহ হচ্ছেন সমুচিত মূল্যদানকারী, সর্বজ্ঞ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قَامُوا كُسَالَىٰ – আল্লাহ্‌র বাণীতে যে শিথিলতার নিন্দা করা হয়েছে তা হচ্ছে বিশ্বাসের শিথিলতা। বিশ্বাস সুদৃঢ় থাকা সত্ত্বেও আমলের মধ্যে যদি কোন শৈথিল্য থাকে, তবে তা অত্র আয়াতের আওতাভুক্ত নয়। কিন্তু তখনও বিনা ওযরে শিথিলতা করা নিন্দনীয়। আর রোগকষ্ট, নিদ্রালুতা প্রভৃতি কোন অনিবার্য কারণবশতঃ হলে ক্ষমার্হ।

وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ — অত্র আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলার দরবারে একমাত্র ঐ সব আমলই গৃহীত ও কবুল হয় যা শুধু তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে করা হয়েছে এবং কোনরূপ রিয়াকারী বা স্বার্থের লেশমাত্র যার মধ্যে নেই। মুখলেস শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তফসীরে-মাযহারীতে লিখিত আছে الذى يعمل لله لا يحب ان يحمده الناس عليه অর্থাৎ, মুখলেস সে ব্যক্তিকে বলে যে শুধু আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য সর্বপ্রকার আমল করে এবং ঐ কাজের জন্য লোকের প্রশংসা কামনা করে না।

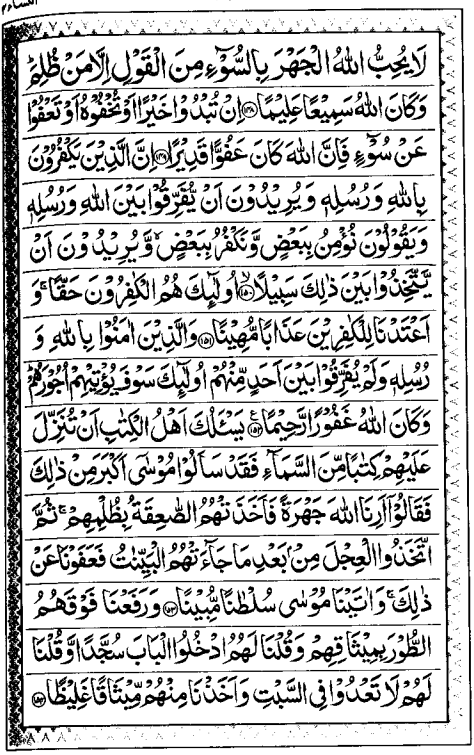

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ؕ
وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ﴿١٤٨﴾ اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا
عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ﴿١٤٩﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ
بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ
وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ
يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ﴿١٥٠﴾ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۚ وَ
اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿١٥١﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ
رُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ؕ
وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٥٢﴾ يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ
عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ ۚ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰٓى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ
فَقَالُوْٓا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ
اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ
ذٰلِكَ ۚ وَاٰتَيْنَا مُوْسٰى سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿١٥٣﴾ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ
الطُّوْرَ بِمِيْثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُلْنَا
لَهُمْ لَا تَعْدُوْا فِى السَّبْتِ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿١٥٤﴾

(১৪৮) আল্লাহ্ কোন মন্দ বিষয় প্রকাশ করা পছন্দ করেন না। তবে কারো প্রতি জুলুম হয়ে থাকলে সে কথা আলাদা। আল্লাহ্ শ্রবণকারী, বিজ্ঞ। (১৪৯) তোমরা যদি কল্যাণ কর প্রকাশ্যভাবে কিংবা গোপনে অথবা যদি তোমরা অপরাধ ক্ষমা করে দাও, তবে জেনো, আল্লাহ্ নিজেও ক্ষমাকারী, মহাশক্তিশালী। (১৫০) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী তদুপরি আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাসে তারতম্য করতে চায় আর বলে যে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি কিন্তু কতককে প্রত্যাখ্যান করি এবং এরই মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করতে চায়। (১৫১) প্রকৃতপক্ষে এরাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী। আর যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী তাদের জন্য তৈরী করে রেখেছি অপমানজনক আযাব। (১৫২) আর যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্র উপর, তাঁর রসূলের উপর এবং তাঁদের কারও প্রতি ঈমান আনতে গিয়ে কাউকে বাদ দেয়নি, শীঘ্রই তাদেরকে প্রাপ্য সওয়াব দান করা হবে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১৫৩) আপনার নিকট আহলে-কিতাবরা আবেদন জানায় যে, আপনি তাদের উপর আসমান থেকে লিখিত কিতাব অবতীর্ণ করিয়ে নিয়ে আসুন। বস্তুতঃ এরা মূসার কাছে এর চেয়েও বড় জিনিস চেয়েছে। বলেছে, একেবারে সামনাসামনিভাবে আমাদের আল্লাহ্কে দেখিয়ে দাও। অতএব, তাদের উপর বজ্রপাত হয়েছে তাদের পাপের দরুন; অতঃপর তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ-নিদর্শন প্রকাশিত হবার পরেও তারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল; তাও আমি ক্ষমা করে দিয়েছিলাম এবং আমি মূসাকে প্রকৃষ্ট প্রভাব দান করেছিলাম। (১৫৪) আর তাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেবার উদ্দেশে আমি তাদের উপর তূর পর্বতকে তুলে ধরেছিলাম এবং তাদেরকে বলেছিলাম, অবনত মস্তকে দরজায় ঢোক। আরো বলেছিলাম, শনিবার দিন সীমালঙ্ঘন করো না। এভাবে তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে দুনিয়া হতে জোর-জুলমের অবসান ঘটানোর বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। তবে তা মানব-রচিত শাসক-সুলভ আইনের মত নয়, বরং ভীতিপ্রদর্শন ও আশ্বাসদানের মাধ্যমে এক অপূর্ব কানুন পেশ করা হয়েছে। যার মধ্যে একদিকে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা ও অপরাধ দমনের জন্য মজলুমকে অধিকার দেয়া হয়েছে যে, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করতে পারবে, তাকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারবে। অপরদিকে সূরায়ে নহ্ল-এর আয়াতে একটি শর্ত আরোপ করে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ ؕ وَلَئِنْ
صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ

অর্থাৎ, আর যদি তোমরা প্রতিশোধ নিতে চাও, তবে তোমাদের উপর যে পরিমাণ জুলুম করা হয়েছে, তোমরা ঠিক ততটুকুই প্রতিশোধ নিতে পার। তবে শর্ত হলো এই যে, প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তোমরা আবার জুলুম ও বাড়াবাড়ি করো না, বরং ইনসাফের গণ্ডীর মধ্যে থাকবে, অন্যথায় তোমরাও অত্যাচারী ও অপরাধী সাব্যস্ত হবে। সাথে সাথে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, প্রতিশোধ গ্রহণ করার ক্ষমতা ও অধিকার থাকা সত্ত্বেও যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং ক্ষমা করে দাও, তবে নিঃসন্দেহে তা তোমাদের জন্য অতি উত্তম।

এ আয়াতে করীমার দ্বারা আরো বোঝা যায় যে, মজলুম ব্যক্তি যদি অত্যাচারীর অন্যায়-অত্যাচারের কাহিনী লোকের কাছে প্রকাশ করে বা আদালতে অভিযোগের ফরিয়াদ জানায়, তবে তা শেকায়েত ও হারাম গীবতের আওতায় পড়বে না। কারণ, জালেম নিজেই মজলুমকে অভিযোগ উত্থাপন করতে সুযোগ দিয়েছে ও বাধ্য করেছেন।

সারকথা, কোরআন পাক একদিকে মজলুমকে তার প্রতি জুলুমের সমতুল্য প্রতিশোধ গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছেন। অপরদিকে প্রতিশোধ গ্রহণ করার পরিবর্তে উন্নত চরিত্রের শিক্ষা ও ক্ষমার মনোভাব সৃষ্টি করার জন্য পরকালের উত্তম প্রতিদানের আশ্বাস শুনিয়ে ক্ষমা ও ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেছেনঃ

اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ
عَفُوًّا قَدِيْرًا

অর্থাৎ, "যদি তোমরা কোন উত্তম কাজ প্রকাশ্যে কর, বা উহা গোপনে কর, অথবা কারো কোন অন্যায়কে ক্ষমা করে দাও, তবে তা অতি উত্তম। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা অতিশয় ক্ষমা পরায়ণ, ক্ষমতাবান।"

অত্র আয়াতের মুখ্য উদ্দেশ্য কারো অন্যায়কে ক্ষমা করার আদর্শ শিক্ষা দেওয়া। প্রকাশ্যে বা গোপনে নেক কাজ করার উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ক্ষমা করাও একটি বিশিষ্ট সৎকার্য। যে ব্যক্তি অন্যের অপরাধ মার্জনা করবে, সে আল্লাহ্ তাআলার ক্ষমা ও করুণার যোগ্য হবে।

আয়াতের শেষে اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا বলে জানিয়ে

দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা সর্বশক্তিমান, যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দিতে পারেন এবং যখন ইচ্ছা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারেন। তথাপি তিনি অতি ক্ষমাশীল। আর মানুষের শক্তি ও ক্ষমতা যখন সামান্য ও সীমাবদ্ধ, তাই ক্ষমা ও মার্জনার পথ অবলম্বন করা তার জন্য অধিক বাঞ্ছনীয়।

এ হচ্ছে অন্যায়-অনাচার প্রতিরোধ ও সামাজিক সংস্কার সাধনের ইসলামী মূলনীতি এবং অভিভাবক সুলভ সিদ্ধান্ত। এক দিকে ন্যায়সঙ্গত প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার প্রদান করে ইনসাফ ও ন্যায়নীতিকে সমুন্নত রাখা হয়েছে, অপরদিকে উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতা শিক্ষা দিয়ে ক্ষমা ও মার্জনা করতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। যার অনিবার্য ফলশ্রুতি সম্পর্কে কোরআন করীমের অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

অর্থাৎ, "তোমার ও অন্য যে ব্যক্তির মধ্যে দুশমনী ছিল, এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি আন্তরিক বন্ধু হয়ে যাবে।"

আইন-আদালত বা প্রতিশোধ গ্রহণ করার মাধ্যমে যদিও অন্যায়-অত্যাচার প্রতিরোধ করা যায়, কিন্তু এর দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়া অব্যাহত থাকে। যার ফলে পারস্পরিক বিবাদের সূত্রপাত হওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান থাকে। কিন্তু কোরআন করীম যে অপূর্ব নৈতিকতার আদর্শ শিক্ষা দিয়েছে, তার ফলে দীর্ঘকালের শত্রুতাও গভীর বন্ধুত্বে রূপান্তরিত হয়ে থাকে।

এখানে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে কোরআন পাক স্পষ্ট ফয়সালা দিয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলাকে মান্য করে কিন্তু তাঁর রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, অথবা কোন পয়গম্বরকে মান্য করে, আর কোন পয়গম্বরকে অমান্য করে আল্লাহ্ তাআলার সমীপে সে ঈমানদার নয়, বরং প্রকাশ্য কাফের, পরকালে তার পরিত্রাণ লাভের কোন উপায় নেই।

একমাত্র ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে মুক্তি নেই ঃ কোরআন হাকীমের উপরোক্ত স্পষ্ট ঘোষণা ঐ সব বিভ্রান্ত লোকদের হীনমন্যতা ও গোঁজামিলকেও ফাঁস করে দিয়েছে, যারা অন্যান্য ধর্মানুসারীদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করতে গিয়ে নিজেদের ধর্মমত ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে বিজাতির পদমূলে উৎসর্গ করতে ব্যগ্র। যারা কোরআন ও হাদীসের স্পষ্ট ফয়সালাকে উপেক্ষা করে অন্যান্য ধর্মানুসারীদেরকে বুঝাতে চায় যে, "মুসলমানদের মতেও শুধু ইসলামই একমাত্র মুক্তিসনদ নয়, বরং ইহুদী ও খৃস্টানরাও তাদের নিজ নিজ ধর্মে-কর্মে স্থির থেকে পরকালে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। অথচ তারা অধিকাংশ রসূলকে অথবা অন্ততঃ কোন কোন পয়গম্বরকে অমান্য করে। যার ফলে তাদের কাফের ও জাহান্নামী হওয়ার কথা অত্র আয়াতে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে।"

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, অমুসলমানদের প্রতি ইনসাফ, ন্যায়নীতি, সমবেদনা, সহানুভূতি, উদারতা ও এহসান বা হিতকামনার দিক দিয়ে ইসলাম নজীর বিহীন। কিন্তু উদারতা বা সহানুভূতি ব্যক্তিগত অধিকারের আওতায় হয়ে থাকে যা আমরা যে কোন ব্যক্তিকে উৎসর্গ করতে পারি। অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ বা অনধিকার চর্চা করা যাবে না। ইসলাম একদিকে অমুসলমানদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও পরমসহিষ্ণুতার ক্ষেত্রে যেমন উদার ও অবারিত দ্বার, অপরদিকে স্বীয় সীমারেখা সংরক্ষণের ব্যাপারে অতি সতর্ক, সজাগ ও কঠোর। ইসলাম অমুসলমানদের প্রতি উদারতার সাথে সাথে কুফরী ও কু-প্রথার প্রতি পূর্ণ ঘৃণা প্রকাশ করে। ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলমান ও অমুসলমানরা দু'টি পৃথক জাতি এবং মুসলমানদের জাতীয় প্রতীক ও স্বাতন্ত্র্য সযত্নে সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। শুধু ইবাদতের ক্ষেত্রেই স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখলে চলবে না, বরং সামাজিকতার ক্ষেত্রেও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে হবে। একথা কোরআন ও হাদীসে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।

কোরআন পাক ও ইসলামের অভিমত যদি এই হতো যে, যে কোন ধর্মমতের মাধ্যমে মুক্তি লাভ করা সম্ভব, তাহলে ইসলাম প্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। হযরত রসূলে করীম (সাঃ) ও খোলাফায়ে-রাশেদীনের জেহাদ পরিচালনা করা এমন কি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) - এর নবুওয়ত ও কোরআন নাযিল করা নিরর্থক হতো। - (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকা)।

সূরা বাকারার ৬২ তম আয়াত দ্বারা কেউ কেউ হয়ত সন্দেহে পতিত হতে পারেন যে, এতে এরশাদ করা হয়েছেঃ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

অর্থাৎ - নিশ্চয় যারা সত্যিকারভাবে ঈমান এনেছে (মুসলমান হয়েছে) এবং যারা ইহুদী হয়েছে এবং নাসারা (খৃস্টান) ও সাবেয়ীনদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ তাআলার প্রতি ও কেয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান এনেছে আর সৎকাজ করেছে, তাদের পালনকর্তার সমীপে তাদের জন্য পূর্ণ প্রতিদান সংরক্ষিত রয়েছে। তাদের কোন শংকা নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

অত্র আয়াতে ঈমানদারীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়ার পরিবর্তে শুধু আল্লাহ্ তাআলার প্রতি ও কেয়ামতের প্রতি ঈমান আনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাই যারা সামান্য পড়াশোনা করে কোরআন উপলব্ধি করতে চায়, তারা অত্র আয়াত দ্বারা ধারণা করে বসেছে যে, শুধু আল্লাহ্ তাআলা ও কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাস করাই পরকালীন মুক্তির জন্য যথেষ্ট; নবী-রসূলগণের প্রতি ঈমান আনা মুক্তির পূর্বশর্ত নয়। কিন্তু তারা একথা জানে না যে, কোরআনের পরিভাষায় আল্লাহ্ তাআলার প্রতি ঈমান তখনই শুধু গ্রহণযোগ্য ও ধর্তব্য হয় যখন তার সাথে পয়গম্বর, ফেরেশতা ও আসমানী কিতাবের প্রতিও ঈমান আনা হয়। অন্যথায় শুধু আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও একত্ববাদ তো স্বয়ং শয়তানও স্বীকার করে। কোরআন করীমের ভাষায় শুনুনঃ

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

অর্থাৎ - তাদের ঈমান ঐ সময় গ্রহণযোগ্য ও তারা হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে, যখন তারা তোমাদের সাধারণ মুসলমানদের মত পুরোপুরি ঈমান আনবে। যার মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার প্রতি ঈমানের সাথে সাথে নবিগণের প্রতিও ঈমান আনয়ন করা অপরিহার্য। আর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে চিনে রাখো যে, তারা আল্লাহ্ ও রসূলের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি করতে সচেষ্ট। অতএব, আপনার পক্ষে আল্লাহ্ তাআলাই তাদের মোকাবেলায় যথেষ্ট এবং তিনি সব কিছু শুনেন ও জানেন।

সূরা নিসার আলোচ্য আয়াতে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলার প্রেরিত কোন একজন নবীকেও যেব্যক্তি অস্বীকার

হবে সে প্রকাশ্য কাফের, তার জন্য জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাব অবধারিত। রসূলের প্রতি ঈমান ছাড়া আল্লাহ্ তাআলার প্রতি সত্যিকার ঈমান সাব্যস্ত হয় না।

শেষ আয়াতে পুনরায় দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আখেরাতের মুক্তি ও কামিয়াবী শুধু ঐ সব লোকের জন্যেই সংরক্ষিত যারা আল্লাহ্ তাআলার প্রতি ঈমানের সাথে সাথে তাঁর নবী ও রসূলগণের প্রতিও যথার্থ ঈমান ও আস্থা রাখে।

হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন—

ان القرءان يفسر بعضه بعضا

অর্থাৎ – ''নিশ্চয় কোরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতের ব্যাখ্যা ও তফসীর করে।'' অতএব, কোরআনী তফসীরের পরিপন্থী কোন তফসীর বর্ণনা কারো জন্য জায়েয নয়।

কতিপয় ইহুদী দলপতি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে বলল, আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন, তবে হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি যেমন লিপিবদ্ধ আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছিল, আপনিও তদ্রূপ একখানি লিপিবদ্ধ কিতাব আসমান থেকে নিয়ে আসুন। তাহলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করবো। তারা আন্তরিকভাবে ঈমানের আগ্রহ কিংবা সত্যানুসন্ধিৎসার কারণে এহেন আবদার করে নাই। বরং জিদ ও হঠকারিতার কারণে একের পর এক বাহানার আশ্রয় নিতে অভ্যস্ত ছিল। আল্লাহ্ তাআলা এ আয়াত দ্বারা ইহুদীদের স্বরূপ উদঘাটন করে তাদের হঠকারী মনোভাব সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে ওয়াকিফহাল করেন এবং সান্ত্বনা দান করেন যে, এরা এমন এক জাতি-গোষ্ঠীর সদস্য যারা পূর্ববর্তী রসূলগণকেও উত্যক্ত-বিরক্ত করতো, খোদাদ্রোহিতামূলক বড় বড় অপরাধও নির্দ্বিধায় করে বসতো। এদের পূর্বসুরিরা হযরত মূসা (আঃ)-এর কাছে আবদার করেছিল যে, সরাসরি ও প্রকাশ্যেভাবে আমাদেরকে আল্লাহ্ দেখাতে হবে। এহেন চরম স্পর্ধার কারণে তাদের উপর অকস্মাৎ বজ্রপাত হয়েছিল এবং তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। পরবর্তী ইহুদীরা অদ্বিতীয় মাবুদ আল্লাহ্ তাআলার চিরন্তন সত্তা ও একত্ববাদের অকাট্য প্রমাণাদি অর্থাৎ, হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রকাশ্য মোজেযাসমূহ ও ফেরাউনের শোচনীয় সলিল সমাধির দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার পরও আল্লাহ্ তাআলাকে ত্যাগ করে গো-বৎসের পূজায় লিপ্ত হয়েছিল। এসব অপকর্মের কারণে তারা সমূলে উৎখাতযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও আমি তাদেরকে ক্ষমা করেছি এবং হযরত মূসা (সাঃ)-কে কামিয়াব ও বিজয়ী করেছি। তারা তাওরাতের অনুশাসন মানতে স্পষ্ট অস্বীকার করায় আমি তূর পাহাড়কে তাদের উপর তুলে এনে ঝুলিয়ে দিয়েছি, যাতে হয়ত তারা শরীয়তের বিধান মানতে বাধ্য হবে, অথবা তাদেরকে পাহাড়ের নীচে পিষে মারা হবে। আমি তাদেরকে আরো নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, তারা যখন 'ইলইয়া' শহরের দ্বারদেশে উপনীত হবে, তখন অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ্র আনুগত্যের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত অন্তরে অবনত মস্তকে শহরে প্রবেশ করবে। আমি আরো জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, শনিবার দিন মৎস্য শিকার করবে না। এসব তোমাদের প্রতি আমার নির্দেশ। অতএব, এগুলো লংঘন করো না। এভাবে আমি তাদের থেকে দৃঢ় শপথ গ্রহণ নিয়েছিলাম কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, তারা একে একে প্রত্যেকটি নির্দেশ অমান্য করেছে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। অতএব, আমি দুনিয়াতেও তাদেরকে লাঞ্ছিত করেছি এবং আখেরাতেও তাদের নিকৃষ্টতর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْۢبِيَآءَ
بِغَيْرِ حَقٍّ وَّقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ؕ بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ
فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۱۵۵﴾ وَّبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا
عَظِيْمًا ﴿۱۵۶﴾ وَّقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ
اللّٰهِ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ
اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ؕ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ
الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ﴿۱۵۷﴾ بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا
حَكِيْمًا ﴿۱۵۸﴾ وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚ
وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ﴿۱۵۹﴾ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا
حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
كَثِيْرًا ﴿۱۶۰﴾ وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿۱۶۱﴾ لٰكِنِ
الرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ
وَمَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ
الْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ اُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۱۶۲﴾

(১৫৫) অতএব, তারা যে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল, তা ছিল তাদেরই অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য এবং অন্যায়ভাবে রসূলগণকে হত্যা করার কারণে এবং তাদের এই উক্তির দরুন যে, 'আমাদের হৃদয় আচ্ছন্ন।' অবশ্য তা নয়, বরং কুফরীর কারণে স্বয়ং আল্লাহ্ তাদের অন্তরের উপর মোহর এঁটে দিয়েছেন। ফলে এরা ঈমান আনে না কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক। (১৫৬) আর তাদের কুফরী এবং মরিয়মের প্রতি মহা-অপবাদ আরোপ করার কারণে। (১৫৭) আর তাদের একথা বলার কারণে যে, আমরা মরিয়ম পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি যিনি ছিলেন আল্লাহর রসূল। অথচ তারা না তাঁকে হত্যা করেছে, আর না শূলীতে চড়িয়েছে, বরং তারা এরূপ ধাঁধায় পতিত হয়েছিল। বস্তুতঃ তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে, তারা এক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে, শুধুমাত্র অনুমান করা ছাড়া তারা এ বিষয়ে কোন খবরই রাখে না। আর নিশ্চয়ই তাঁকে তারা হত্যা করেনি। (১৫৮) বরং তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ্ তা'আলা নিজের কাছে। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (১৫৯) আর আহলে-কিতাবদের মধ্যে যত শ্রেণী রয়েছে তারা সবাই ঈমান আনবে ঈসার উপর তাদের মৃত্যুর পূর্বে। আর কেয়ামতের দিন তাদের জন্য সাক্ষীর উপর সাক্ষী উপস্থিত হবে। (১৬০) বস্তুতঃ ইহুদীদের জন্য আমি হারাম করে দিয়েছি বহু পূত-পবিত্র বস্তু যা তাদের জন্য হালাল ছিল—তাদের পাপের কারণে এবং আল্লাহ্র পথে অধিক পরিমাণে বাধা দানের দরুন। (১৬১) আর এ কারণে যে, তারা সুদ গ্রহণ করত, অথচ এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল এবং এ কারণে যে, তারা অপরের সম্পদ ভোগ করতো অন্যায়ভাবে। বস্তুতঃ আমি কাফেরদের জন্য তৈরী করে রেখেছি বেদনাদায়ক আযাব। (১৬২) কিন্তু যারা তাদের মধ্যে জ্ঞানপক্ক ও ঈমানদার, তারা তাও মান্য করে যা আপনার উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আপনার পূর্বে। আর যারা নামাযে অনুবর্তিতা পালনকারী, যারা যাকাত দানকারী এবং যারা আল্লাহ্ ও কেয়ামতে আস্থাশীল। বস্তুতঃ এমন লোকদেরকে আমি দান করবো মহাপুণ্য।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা আলে-ইমরানের — يٰعِيْسٰۤى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা দুশমন ইহুদীদের দুরভিসন্ধি বানচাল করে তাদের কবল থেকে হযরত ঈসা (আঃ)-কে হেফাযত করা প্রসঙ্গে পাঁচটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। যার বিস্তারিত ব্যাখ্যা সূরা আলে-ইমরানের তফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম ওয়াদা ছিল তাঁকে হত্যা করার কোন সুযোগ ইহুদীদেরকে দেয়া হবে না, বরং আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে নিজের কাছে তুলে নেবেন। সূরায়ে নিসার আলোচ্য আয়াতে ইহুদীদের দুষ্কর্মের বর্ণনার সাথে সাথে খোদায়ী ওয়াদা বাস্তবায়নের কথা উল্লেখ করে হযরত ঈসা (আঃ)- এর হত্যা সংক্রান্ত ইহুদীদের মিথ্যা দাবী খণ্ডন করা হয়েছে। এখানে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে যে, وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ – অর্থাৎ – ওরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে হত্যাও করতে পারেনি, শূলেও চড়াতে পারেনি, বরং আসলে ওরা সন্দেহে পতিত হয়েছিল।

সন্দেহ কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল ঃ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ – এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমামে-তফসীর হযরত যাহ্হাক (রাহঃ) বলেন— ইহুদীরা যখন হযরত ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করতে বদ্ধপরিকর হলো, তখন তাঁর ভক্ত সহচরবৃন্দ এক স্থানে সমবেত হলেন। হযরত ঈসা (আঃ)ও সেখানে উপস্থিত হলেন। শয়তান ইবলীস তখন রক্তপিপাসু ইহুদী ঘাতকদেরকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর অবস্থানের ঠিকানা জানিয়ে দিল। চার হাজার ইহুদী দুরাচার একযোগে গৃহ অবরোধ করলো। তখন হযরত ঈসা (আঃ) স্বীয় ভক্ত অনুচরগণকে সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ এ গৃহ হতে বহির্গত ও নিহত হতে এবং পরকালে বেহেশতে আমার সাথী হতে প্রস্তুত আছো কি? জনৈক ভক্ত আত্মোৎসর্গের জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। হযরত ঈসা (আঃ) নিজের জামা ও পাগড়ী তাঁকে পরিধান করালেন। অতঃপর তাঁকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাদৃশ করে দেয়া হলো। যখন তিনি গৃহ থেকে বহির্গত হলেন, তখন ইহুদীরা ঈসা (আঃ) মনে করে তাঁকে বন্দী করে নিয়ে গেল এবং শূলে চড়িয়ে হত্যা করলো। অপরদিকে হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্ তাআলা আসমানে তুলে নিলেন।-(তফসীরে-কুরতুবী)।

অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, ইহুদীরা 'তায়তালানুস' নামক জনৈক নরাধমকে সর্বপ্রথম হযরত ঈসা (আঃ) -কে হত্যা করার জন্য পাঠিয়েছিল। কিন্তু ইতিপূর্বে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে আসমানে তুলে নেওয়ায় সে তাঁর নাগাল পেল না। বরং ইতিমধ্যে তার নিজের চেহারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর মত হয়ে গেল। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে সে যখন গৃহ থেকে বেরিয়ে এল তখন অন্যান্য ইহুদীরা তাকেই ঈসা (আঃ) মনে করে পাকড়াও করলো, এবং শূলেতে বিদ্ধ করে হত্যা করলো। -(তফসীরে-মাযহারী)

উপরোক্ত বর্ণনাদ্বয়ের মধ্যে যে কোনটিই সত্য হতে পারে। কোরআন করীম এ সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু ব্যক্ত করেনি। অতএব, প্রকৃত ঘটনার সঠিক খবর একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই জানেন। অবশ্য কোরআন পাকের আয়াত ও তার তফসীর সংক্রান্ত রেওয়াতে সমন্বয়ে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, প্রকৃত ঘটনা ইহুদী-খৃস্টানদেরও অজ্ঞাত ছিল। তারা চরম বিভ্রান্তির আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়ে শুধু অনুমান করে বিভিন্ন উক্তি ও দাবী করছিল। ফলে উপস্থিত লোকদের মধ্যেই চরম মতভেদ ও বিবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। তাই পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ٠

অর্থাৎ, যারা হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে নানা মতভেদ করে নিশ্চয় এ ব্যাপারে তারা সন্দেহে পতিত হয়েছে। তাদের কাছে এ সম্পর্কে কোন সত্যনির্ভর জ্ঞান নেই। তারা শুধু অনুমান করে কথা বলে। আর তারা যে হযরত ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করেনি, এ কথা সুনিশ্চিত। বরং আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে নিরাপদে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন।'

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, সম্বিত ফিরে পাওয়ার পর কিছু লোক বললো, আমরা তো নিজেদের লোককেই হত্যা করে ফেলেছি। কেননা, নিহত ব্যক্তির মুখমণ্ডল হযরত ঈসা (আঃ)-এর মত হলেও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্য রকম। তদুপরি এ ব্যক্তি যদি ঈসা (আঃ) হয়, তবে আমাদের প্রেরিত লোকটি গেল কোথায়? আর এ ব্যক্তি আমাদের হলে হযরত ঈসা (আঃ)-ই বা কোথায় গেলেন?

وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا অর্থাৎ- আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু অতি পরাক্রমশালী, রহস্যজ্ঞানী।' ইহুদীরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে কতল করার যত ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তই করুক না কেন, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলা যখন তাঁর হেফাযতের নিশ্চয়তা দিয়েছেন তখন তাঁর অসীম কুদরত ও অপার হেকমতের সামনে ওদের অপচেষ্টার কি মূল্য আছে? আল্লাহ্ তাআলা প্রজ্ঞাময়, তাঁর প্রতিটি কাজের নিগূঢ় রহস্য বিদ্যমান রয়েছে। জড়পূজারী বস্তুবাদীরা যদি হযরত ঈসা (আঃ)-কে সশরীরে আসমানে উত্তোলনের সত্যটুকু উপলব্ধি করতে না পারে, তবে তা তাদেরই দুর্বলতার প্রমাণ।

পরিশেষে এ প্রসঙ্গটির উপসংহার টেনে বলা হয়েছে—

وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ

- অর্থাৎ, ইহুদীরা ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার কারণে তাৎক্ষণিকভাবে যদিও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে চিন্তা করে না, এবং হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে, এমনকি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়তকে অস্বীকার করে, কিন্তু তাদের মৃত্যুর পূর্বে এমন এক সময় আসবে, যখন তাদের দৃষ্টির সম্মুখে সত্য উন্মোচিত হবে, তখন তারা যথার্থই বুঝতে পারবে যে, হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে তাদের ধারণা একান্তই ভ্রান্তিপূর্ণ ছিল!

অত্র আয়াতের مَوْتِهِ অর্থাৎ, 'তার মৃত্যুর পূর্বে' শব্দে ইহুদীদের মৃত্যুর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এমতাবস্থায় অত্র আয়াতের তফসীর এই যে, প্রত্যেক ইহুদীই তার অন্তিম মুহূর্তে যখন পরকালের দৃশ্যাবলী অবলোকন করবে, তখন হযরত ঈসা (আঃ)-এর নবুওয়তের সত্যতা ও নিজেদের বাতুলতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে এবং তার প্রতি ঈমান আনয়ন করতে বাধ্য হবে। কিন্তু তখনকার ঈমান তাদের আদৌ কোন উপকারে আসবে না; যেমন লোহিত সাগরে ডুবে মরার সময় ফেরাউনের ঈমান ফলপ্রসূ হয়নি।

দ্বিতীয় তফসীর যা সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়িগণের বিপুল জামাত কর্তৃক গৃহীত এবং সহীহ হাদীস দ্বারা সমর্থিত হয়েছে, তা হলো موتہ 'তার মৃত্যু' শব্দের সর্বনামে হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু বুঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় অত্র আয়াতের তফসীর হলোঃ আহলে-কিতাবরা এখন যদিও হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি সত্যিকার ঈমান আনে না, ইহুদীরা তো তাঁকে নবী বলে স্বীকারই করতো না, বরং ভণ্ড, মিথ্যাবাদী ইত্যাকার আপত্তিকর বিশেষণে ভূষিত করতো। (নাউযুবিল্লাহি মিন যালেকা)। অপর দিকে খৃস্টানরা যদিও ঈসা মসীহ্ (আঃ)-কে ভক্তি ও মান্য করার দাবীদার; কিন্তু তাদের মধ্যে একদল ইহুদীদের মতই হযরত ঈসা (আঃ)-এর ক্রুশ বিদ্ধ হওয়ার এবং মৃত্যুবরণ করার কথায় স্বীকৃতি প্রদান করে চরম মূর্খতার পরিচয় দিচ্ছে। তাদের আরেক দল অতিভক্তি দেখাতে গিয়ে হযরত ঈসা (আঃ)-কে স্বয়ং খোদা বা খোদার পুত্র বলে ধারণা করে বসেছে। কোরআন পাকের এই আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, ইহুদী ও খৃস্টানরা বর্তমানে যদিও হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি যথাযথ ঈমান রাখে না, বরং শৈথিল্য বা বাড়াবাড়ি করে, কিন্তু কিয়ামতের নিকটবর্তী যুগে তিনি যখন পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করবেন, তখন এরাও তাঁর প্রতি পুরোপুরি ঈমান আনয়ন করবে। খৃস্টানরা মুসলমানদের মত সহীহ্ আকীদা ও বিশ্বাসের সাথে ঈমানদার হবে। ইহুদীদের মধ্যে যারা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে, তাদেরকে নিধন ও নিশ্চিহ্ন করা হবে, অবশিষ্টরা ইসলাম গ্রহণ করবে। তখন সমগ্র দুনিয়া থেকে সর্বপ্রকার কুফরী ধ্যান-ধারণা, আচার-অনুষ্ঠান উৎক্ষিপ্ত হয়ে যাবে; সর্বত্র ইসলামের একচ্ছত্র প্রাধান্য কায়েম হবে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ 'হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক রূপে অবশ্যই অবতরণ করবেন। তিনি দাজ্জালকে কতল করবেন, শুকর নিধন করবেন এবং ক্রুশকে চুরমার করবেন। তখন একমাত্র পরোয়ারদেগার আল্লাহ্ তাআলার এবাদত করা হবে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) আরো বলেন— তোমরা ইচ্ছা করলে এখানে কোরআন পাকের এ আয়াত পাঠ করতে পার যাতে বলা হয়েছে— ''আহলে-কিতাবদের মধ্যে কেউ অবশিষ্ট থাকবে না, বরং ওরা তাঁর মৃত্যুর পূর্বে অবশ্যই তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।'' হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ এর অর্থ 'হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর পূর্বে।' এ বাক্যটি তিনি তিন বার উচ্চারণ করেন। - (তফসীরে-কুরতুবী)

ইসলামী শরীয়তেও কোন কোন দ্রব্য পানাহার করা হারাম ঘোষিত হয়েছে। তবে তা শারীরিক বা আধ্যাত্মিক ক্ষতিকর হওয়ার কারণে। পক্ষান্তরে ইহুদীদের জন্য কোন দৈহিক বা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর হওয়ার কারণে পবিত্র দ্রব্য হারাম করা হয়নি, বরং তাদের অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ সেগুলো হারাম করা হয়েছিল।

এই আয়াতে কতিপয় মহান ব্যক্তির জন্য যে বিপুল প্রতিদানের আশ্বাস দেয়া হয়েছে তা তাঁদের ঈমান ও সৎকর্মের কারণে। অন্যথায় শুধু জরুরী আকীদা-বিশ্বাসকে সংশোধনের উপরই আখেরাতের মুক্তি নির্ভরশীল। তবে অবশ্যই ঈমানের সাথে মৃত্যুর সৌভাগ্য হতে হবে।

إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنۢ بَعْدِهٖ ۚ
وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَٰرُونَ وَسُلَيْمَٰنَ ۚ
وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا ﴿١٦٣﴾ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَٰهُمْ عَلَيْكَ مِن
قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ
تَكْلِيمًا ﴿١٦٤﴾ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ
عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾
لَّٰكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُۥ بِعِلْمِهِۦ ۖ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ
يَشْهَدُونَ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿١٦٦﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَ
صَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّوا۟ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ﴿١٦٧﴾ إِنَّ
ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَظَلَمُوا۟ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ
طَرِيقًا ﴿١٦٨﴾ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ
عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٦٩﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ
مِن رَّبِّكُمْ فَـَٔامِنُوا۟ خَيْرًا لَّكُمْ ۚ وَإِن تَكْفُرُوا۟ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِى
ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧٠﴾

(১৬৩) আমি আপনার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি, যেমন করে ওহী পাঠিয়েছিলাম নূহের প্রতি এবং সে সমস্ত নবী-রসূলের প্রতি যাঁরা তাঁর পরে প্রেরিত হয়েছেন। আর ওহী পাঠিয়েছি, ইসমাঈল, ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর সন্তানবর্গের প্রতি এবং ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারূন ও সুলায়মানের প্রতি। আর আমি দাউদকে দান করেছি যবুর গ্রন্থ। (১৬৪) এছাড়া এমন রসূল পাঠিয়েছি যাদের ইতিবৃত্ত আমি আপনাকে শুনিয়েছি ইতিপূর্বে এবং এমন রসূল পাঠিয়েছি যাদের বৃত্তান্ত আপনাকে শোনাইনি। আর আল্লাহ্ মূসার সাথে কথোপথন করেছেন সরাসরি। (১৬৫) সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রসূলগণের পরে আল্লাহ্র প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে। আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রমশীল, প্রাজ্ঞ। (১৬৬) আল্লাহ্ আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন তিনি যে তা সজ্ঞানেই করেছেন, সে ব্যাপারে আল্লাহ নিজেও সাক্ষী এবং ফেরেশতাগণও সাক্ষী। আর সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। (১৬৭) যারা কুফরী অবলম্বন করেছে এবং আল্লাহ্র পথে বাধার সৃষ্টি করেছে, তারা বিভ্রান্তিতে সুদূরে পতিত হয়েছে। (১৬৮) যারা কুফরী অবলম্বন করেছে এবং সত্য চাপা দিয়ে রেখেছে, আল্লাহ্ কখনও তাদের ক্ষমা করবেন না এবং সরল পথ দেখাবেন না। (১৬৯) তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের পথ। সেখানে তারা বাস করবে অনন্তকাল। আর এমন করাটা আল্লাহ্র পক্ষে সহজ। (১৭০) হে মানবজাতি! তোমাদের পালনকর্তার যথার্থ বাণী নিয়ে তোমাদের নিকট রসূল এসেছেন, তোমরা তা মেনে নাও যাতে তোমাদের কল্যাণ হতে পারে। আর যদি তোমরা তা না মান, জেনে রাখ, আসমানসমূহে ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সে সবকিছুই আল্লাহর। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন সর্বজ্ঞ, প্রাজ্ঞ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنۢ بَعْدِهٖ ۚ

– এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, নবিগণের প্রতি প্রেরিত আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ নির্দেশ ও বাণীকে ওহী বলা হয়। পূর্ববর্তী নবিগণের প্রতি যেমন খোদায়ী ওহী নাযিল হয়েছিল, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতিও তেমনি আল্লাহ্ তাআলা ওহী নাযিল করেছেন। অতএব, পূর্ববর্তী নবিগণকে যারা মান্য করে, তারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কেও মান্য করতে বাধ্য। আর যারা তাকে অস্বীকার করে, তারা যেন অন্যসব নবীকে এবং তাদের প্রতি প্রেরিত ওহীকেও অস্বীকার করলো।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি প্রেরিত ওহীকে হযরত নূহ (আঃ) ও তৎপরবর্তী নবিগণের ওহীর সাথে তুলনা করার কারণ হয়ত এই যে, হযরত আদম (আঃ)-এর প্রতি প্রেরিত ওহী ছিল একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের। হযরত নূহ (আঃ)-এর যুগেই তা পূর্ণতা লাভ করেছিল। হযরত আদম (আঃ)-এর প্রতি প্রেরিত ওহী ছিল প্রাথমিক শিক্ষাস্বরূপ, ক্রমে তা উন্নত হতে থাকে এবং পরীক্ষার স্তরে পৌঁছায়। যারা উত্তীর্ণ হলো, তাদের জন্য পুরস্কার, আর যারা অবাধ্যতা করলো তাদের জন্য আযাবের ব্যবস্থা করা হলো। অতএব, শরীয়তের আদেশ-নিষেধ সম্বলিত ওহীপ্রাপ্ত নবিগণের আগমন হযরত নূহ (আঃ) থেকেই শুরু হয়েছিল। অপর দিকে ওহী অস্বীকারকারী বিরুদ্ধাচারীদের উপর সর্বপ্রথম আযাবও হযরত নূহ (আঃ)-এর কালেই আরম্ভ হয়।

সারকথা এই যে, হযরত নূহ (আঃ)-এর পূর্বে আল্লাহ্র ওহীর অবাধ্য ও নবিগণের বিরুদ্ধাচরণকারীদের উপর কোন ব্যাপক আযাব বা গযব আপতিত হতো না। বরং তাদেরকে মাযুর সাব্যস্ত করে অব্যাহতি ও অবকাশ দেয়া হতো, বোঝাবার চেষ্টা করা হতো। হযরত নূহ (আঃ)-এর আমলে যখন ধর্মীয় শিক্ষার অধিকতর প্রচার-প্রসার হয়েছিল এবং আল্লাহ্র হুকুম সম্পর্কে মানুষের কাছে কোন অস্পষ্টতা ছিল না, তখন থেকেই অবাধ্যদের উপর আল্লাহ্র আযাব নাযিল হতে থাকে। হযরত নূহ (আঃ)-এর যমানার সর্বনাশা মহাপ্লাবনই সর্বপ্রথম ব্যাপক ঐতিহাসিক আযাব। পরবর্তী কালে হযরত হুদ (আঃ), হযরত ছালেহ (আঃ), হযরত শোয়ায়েব (আঃ), প্রমুখ পয়গম্বরগণের আমলেও অমান্যকারী নাফরমান কাফেরদের প্রতি বিভিন্ন প্রকার আযাব ও গযব আপতিত হয়েছে। অতএব, প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি প্রেরিত ওহীকে হযরত নূহ (আঃ) ও তৎপরবর্তিগণের ওহীর সাথে তুলনা করে মক্কার মুশরেক ও আহ্লে-কিতাব ইহুদী ও খৃস্টান সম্প্রদায়ের প্রতি পূর্ণ হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, উল্লিখিত চিরাচরিত নিয়মানুসারে তারা যদি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ ওহী অর্থাৎ, কোরআনকে অস্বীকার বা অমান্য করে, তবে তারাও ভয়াবহ শাস্তির আওতায় পড়বে।—(ফাওয়ায়েদে-ওসমানী)

হযরত নূহ (আঃ)-এর অস্তিত্বই ছিল এক অনন্য মো'জেযা। তিনি সুদীর্ঘ সাড়ে নয় শত বছর জীবিত ছিলেন। কিন্তু ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত তার দৈহিক শক্তি বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি, একটি দাঁতও পড়েনি, একগাছি চুলও পাকেনি। তিনি সারা জীবন দেশবাসীর নির্যাতন-নিপীড়ন অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে সহ্য করেছেন।— (তফসীরে-মাযহারী)

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ – "এবং আরো বহু রসূল যাদের ইতিবৃত্তান্ত আপনাকে শুনিয়েছি।" এ আয়াতে হযরত নূহ (আঃ)-এর পরে

যেসব পয়গম্বর আগমন করেছেন, তাদের সম্পর্কে প্রথমে সাধারণভাবে করার পর তন্মধ্যে বিশিষ্ট ও মর্যাদাসম্পন্ন কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বোঝানো হয়েছে যে, এঁরা সবাই আল্লাহ্র পয়গম্বর এবং নবিগণের নিকটে বিভিন্ন পন্থায় ওহী প্রেরিত হয়েছে। কখনো ফেরেশতার মাধ্যমে ওহী পৌছেছে, কখনো লিপিবদ্ধ কিতাব আকারে এসেছে, আবার কখনো আল্লাহ্ তাআলা রসূলের সাথে সরাসরি কথোপকথন করেছেন। সারকথা যে কোন পন্থায় ওহী পৌছুক না কেন, তদনুযায়ী আমল করা মানুষের একান্ত কর্তব্য। অতএব, ইহুদীদের এরূপ আবদার করা যে, তওরাতের মত লিখিত কিতাব নাযিল হলে আমরা মান্য করবো, অন্যথায় নয়—সম্পূর্ণ আহম্মকী ও স্পষ্ট কুফরী।

হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন— আল্লাহ্ তাআলা একলাখ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন, যাঁদের মধ্যে স্বতন্ত্র শরীয়তের অধিকারী রসূলের সংখ্যা ছিল তিন 'শ তের জন।— (তফসীরে–কুরতুবী)

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ — "পয়গম্বরগণ সুসংবাদ দানকারী এবং ভীতি প্রদর্শনকারী।" আল্লাহ্ তাআলা ঈমানদারদের ঈমান ও সৎকর্মশীলতার পুরস্কারস্বরূপ বেহেশতের সুসংবাদ দান করার জন্য এবং কাফের, বেঈমান ও দুরাচারদের কুফরী ও অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ভীতি প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে, দেশে দেশে অব্যাহতভাবে নবী প্রেরণ করেছেন যেন কেয়ামতের শেষ বিচারের দিনে অবাধ্য ব্যক্তিরা অজুহাত উত্থাপন করতে না পারে যে, ইয়া আল্লাহ্, কোন্ কাজে আপনি সন্তুষ্ট আর কোন্ কাজে বিরাগ হন, তা আমরা উপলব্ধি করতে পারিনি। জানতে পারলে অবশ্যই আমরা আপনার সন্তুষ্টির পথ অবলম্বন করতাম। অতএব, আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনীয় এবং আমরা নিরপরাধ। পথভ্রষ্ট লোকেরা যাতে এহেন অজুহাত পেশ করতে বা বাহানার আশ্রয় নিতে না পারে, তজ্জন্য আল্লাহ্ তাআলা অলৌকিক মোজেযাসহ নবিগণকে প্রেরণ করেছেন এবং তারা সর্বস্ব উৎসর্গ করে সত্য পথ প্রদর্শন করেছেন। অতএব, এখন আর সত্য দ্বীন ইসলাম গ্রহণ না করার ব্যাপারে কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না, কোন বাহানারও অবকাশ নেই। আল্লাহ্র ওহী এমন এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ যার মোকাবিলায় অন্য কোন প্রমাণই কার্যকর হতে পারে না। কোরআন পাক এমন এক অকাট্য দলীল যার সামনে কোন অযুক্তি টিকেত পারে না। আল্লাহ্ তাআলা হেকমত ও তদবীরের এটা এক কল্পনাতীত নিদর্শন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন— একদা হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সমীপে একদল ইহুদী উপস্থিত হলো। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, – আল্লাহ্র কসম! তোমরা সন্দেহাতীতভাবে জান যে, আমি আল্লাহ্ তাআলার সত্য রসূল। তারা অস্বীকার করলো। তখনই ওহী নাযিল হল ঃ لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা ঐ কিতাবের (আল-কোরআনের) মাধ্যমে যা তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞানের নিদর্শন, আপনার নবুওতের সাক্ষ্য দিচ্ছেন। তিনি আপনাকে ঐ কিতাবেরযোগ্য জেনেই কিতাব নাযিল করেছেন। আর ফেরেশেতাগণও এর সাক্ষী। অধিকন্তু সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ তাআলার সাক্ষ্যদানের পর আর কোন সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন নাই।

মহানবী (সাঃ) ও কোরআন পাকের সত্যতা প্রমাণের পর আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ এখনও যারা কোরআন মজীদ ও রসূলে করীম (সাঃ)-কে অস্বীকার করে এবং তওরাতে রসূল (সাঃ)-এর যেসব গুণ-বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ রয়েছে তা গোপন করে এবং এক কথায় অন্য কথা লোকের কাছে প্রকাশ করে এবং তাদেরকে সত্য দ্বীন হতে বিরত ও বঞ্চিত করে, এহেন চরম অপরাধীদের কস্মিনকালেও ক্ষমা ও হেদায়েত লাভের সৌভাগ্য হবে না। এতদ্বারা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, একমাত্র হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আনুগত্যের মধ্যেই হেদায়েত সীমাবদ্ধ ; তাঁর অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচারণ করা চরম গোমরাহী। অতএব, ইহুদীদের-ধ্যান-ধারণা, ধর্ম-কর্ম ভ্রান্ত ও বাতিল।

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ
اِلَّا الْحَقَّ ۭ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ
اَلْقٰىهَآ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ۡ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۣ وَلَا
تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ۭ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ۭ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۭ
سُبْحٰنَهٗٓ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي
الْاَرْضِ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿١٧١﴾ لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ
يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰۗىِٕكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ۭ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ
عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ﴿١٧٢﴾ فَاَمَّا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَ
يَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا
فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ڏ وَّلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ
وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿١٧٣﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاۗءَكُمْ بُرْهَانٌ
مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا ﴿١٧٤﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ
مِّنْهُ وَفَضْلٍ ۙ وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿١٧٥﴾

(১৭১) হে আহলে-কিতাবগণ! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ্‌র শানে নিতান্ত সঙ্গত বিষয় ছাড়া কোন কথা বলো না। নিঃসন্দেহে মরিয়ম পুত্র মসীহ ঈসা আল্লাহ্‌র রসূল এবং তাঁর বাণী যা তিনি প্রেরণ করেছেন মরিয়মের নিকট এবং রূহ—তাঁরই কাছ থেকে আগত। অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌কে এবং তার রসূলগণকে মান্য কর। আর একথা বলো না যে, আল্লাহ্ তিনের এক, একথা পরিহার কর; তোমাদের মঙ্গল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ একক উপাস্য। সন্তান-সন্ততি হওয়াটা তাঁর যোগ্য বিষয় নয়। যা কিছু আসমানসমূহ ও যমীনে রয়েছে সবই তার। আর কর্মবিধানে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট (১৭২) মসীহ আল্লাহ্‌র বান্দা হবেন, তাতে তার কোন লজ্জাবোধ নেই এবং ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাদেরও না। বস্তুতঃ যারা আল্লাহ্‌র দাসত্বে লজ্জাবোধ করবে এবং অহংকার করবে, তিনি তাদের সবাইকে নিজের কাছে সমবেত করবেন। (১৭৩) অতঃপর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তিনি তাদেরকে পরিপূর্ণ সওয়াব দান করবেন, বরং স্বীয় অনুগ্রহে আরো বেশী দেবেন। পক্ষান্তরে যারা লজ্জাবোধ করেছে এবং অহঙ্কার করেছে তিনি তাদেরকে দেবেন বেদনাদায়ক আযাব। আল্লাহ্‌কে ছাড়া তারা কোন সাহায্যকারী ও সমর্থক পাবে না। (১৭৪) হে মানবকুল! তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সনদ পৌঁছে গেছে। আর আমি তোমাদের প্রতি প্রকৃষ্ট আলো অবতীর্ণ করেছি। (১৭৫) অতএব, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাতে দৃঢ়তা অবলম্বন করেছে তিনি তাদেরকে স্বীয় রহমত ও অনুগ্রহের আওতায় স্থান দেবেন এবং নিজের দিকে আসার মত সরল পথে তুলে দেবেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَكَلِمَتُهٗ শব্দে বাতলে দেয়া হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ্‌র কালেমা। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তফসীরকারগণ বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেছেন।

(এক) হযরত ইমাম গাযযালী (রাহঃ) বলেনঃ কোন শিশুর জন্ম লাভের জন্য দু'টি শক্তির যৌথ ভূমিকা থাকে। তন্মধ্যে একটি হলো নারী-পুরুষের বীর্যের সম্মেলন। দ্বিতীয় শক্তি আল্লাহ্ তাআলার كن (হও) নির্দেশ দান; যার ফলে উক্ত শিশুর অস্তিত্বের সঞ্চার হয়ে থাকে। হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্ম লাভের ক্ষেত্রে প্রথম শক্তি বর্তমান ছিল না। তাই দ্বিতীয় শক্তির সাথে সম্পর্কিত করে তাঁকে কালেমাতুল্লাহ্ বলা হয়েছে। যার তাৎপর্য এই যে, তিনি বস্তুগত কার্যকারণ ছাড়া শুধুমাত্র আল্লাহ্ তাআলার كن (হয়ে যাও) নির্দেশের প্রভাবে জন্মলাভ করেছেন। এমতাবস্থায় اَلْقٰىهَآ اِلٰى مَرْيَمَ বাক্যের অর্থ হবে এই যে, আল্লাহ্ তাআলা এ কালেমাটি হযরত জিবারঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে হযরত মরিয়মের কাছে পৌঁছে দিলেন, আর হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মগ্রহণের মাধ্যমে তা কার্যকর ও বাস্তবায়িত হলো।

(দুই) কারো মতে 'কালেমাতুল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্‌র সুসংবাদ। এর দ্বারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর ব্যক্তি-সত্তাকে বোঝানো হয়েছে। ইতিপূর্বে আল্লাহ্ তাআলা ফেরেশতার মাধ্যমে হযরত মরিয়ম (আঃ)-কে হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে যে সুসংবাদ দান করেছিলেন সেখানে 'কালেমা' শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। যথাঃ اِذْ قَالَتِ الْمَلٰۗىِٕكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ এবং ফেরেশতারা বললো-যে মরিয়ম! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে সু-সংবাদ দিচ্ছেন 'কালেমা' সম্পর্কে।

(তিন) কারো মতে এখানে 'কালেমা' অর্থ নিদর্শন। যেমন, অন্য এক আয়াতে শব্দটি নিদর্শন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا

وَرُوْحٌ مِّنْهُ — এ শব্দে দুটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ হযরত ঈসা (আঃ)-কে 'রূহ' বলার তাৎপর্য কি? দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্ তাআলার সাথে তাঁকে বিশেষভাবে সম্পর্কিত করার কারণ কি?

এ সম্পর্কে তফসীরকারগণের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে—(এক) কারো মতে 'রূহ' অতিশয় পবিত্র বস্তু হওয়ার কারণে এরূপ বলা হয়েছে। কেননা, প্রচলিত রীতি রয়েছে যে, কোন বস্তুর অধিক পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা বোঝাবার জন্য তাকে সরাসরি ' রূহ' বলা হয়। হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মলাভের মধ্যে যেহেতু বীর্যের কোন দখল ছিল না, বরং তিনি শুধু আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছা এবং كن নির্দেশের ভিত্তিতে জন্মলাভ করেছিলেন, কাজেই দৈহিক পবিত্রতার দিক দিয়ে তিনি শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। অতএব, প্রচলিত রীতি অনুসারে তাঁকে 'রূহ' বলা হয়েছে। আর আল্লাহ্ তাআলার সাথে তাঁকে বিশেষভাবে সম্পর্কিত করার উদ্দেশ্য সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা। যেমন, মসজিদের সম্মানার্থ সেটিকে 'আল্লাহ্‌র মসজিদ' বলা হয়, কাবা শরীফকে বায়তুল্লাহ বা আল্লাহ্‌র ঘর বলা হয়; অথবা কোন একান্ত আনুগত বান্দাকে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পৃক্ত করে আবদুল্লাহ বা আল্লাহ্‌র বান্দা বলা হয়। যেমন, সূরা বনী-ইসরাঈলের اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ আয়াতে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে 'আল্লাহ্‌র বান্দা' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

(দুই) কারো মতে আধ্যাত্মিক জীবন দান করে মানুষের মৃতপ্রায় হৃদয়কে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য হযরত ঈসা (আঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন। দৈহিক জীবনের মূল যেমন রূহ বা প্রাণ, তদ্রূপ হযরত ঈসা (আঃ) ছিলেন আধ্যাত্মিক জীবনের প্রাণ স্বরূপ। অতএব, তাঁকে 'রূহ' বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। যেমন وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا আয়াতে পবিত্র কোরআনকেও 'রূহ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। কেননা, কোরআনপাক আধ্যাত্মিক জীবনের উৎসমূল।

(তিন) কেউ বলেন—'রূহ' শব্দটি রহস্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে এ অর্থই অধিক সমীচীন। কারণ, হযরত ঈসা (আঃ)-এর নজীরহীন ও বিস্ময়কর জন্ম আল্লাহ্ তাআলার অসীম কুদরতের নিদর্শন ও রহস্য। এজন্যই তাঁকে 'রূহুল্লাহ' বলা হয়।

(চার) আরেকটি অভিমত এই যে, روح (রূহ) শব্দ ফুঁক অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ্ পাকের নির্দেশক্রমে হযরত জিবরাঈল (আঃ) হযরত মরিয়ম (আঃ)-এর গলবন্দে ফুঁক দিয়েছিলেন। আর তার ফলেই তিনি গর্ভবতী হয়েছিলেন। যেহেতু হযরত ঈসা (আঃ) শুধু ফুৎকারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাই তাঁকে রূহুল্লাহ্ খেতাব দেয়া হয়েছে। কোরআন পাকে এদিকেই ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে। فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا

এতদ্ব্যতীত আরো কতিপয় ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে। তবে হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র সত্তার অংশ ছিলেন বা আল্লাহই ঈসা (আঃ)-এর মানবীয় দেহে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন-এমন অর্থ করা বা ধারণা পোষণ করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও বাতিল।

একটি ঘটনা ঃ আল্লামা আলুসী (রাহঃ) লিখেছেন যে, একদিন খলিফা হারুনুর রশীদের দরবারে জনৈক খৃস্টান চিকিৎসক হযরত আলী ইবনে হোসাইন ওয়াকেদীর সাথে তর্কে প্রবৃত্ত হয়। সে বলল,—তোমাদের কোরআনে এমন একটি শব্দ রয়েছে যার দ্বারা বোঝা যায় যে, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র অংশ ছিলেন। প্রমাণ স্বরূপ সে কোরআনের وَرُوْحٌ مِّنْهُ শব্দটি পেশ করল। তদুত্তরে আল্লামা ওয়াকেদী কোরআন পাকের আয়াত وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ পাঠ করলেন। এখানে جَمِيْعًا مِّنْهُ শব্দ দ্বারা সব কিছুকে আল্লাহ্ তাআলার সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। যার অর্থ আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্র অংশ হতে। অতএব, وَرُوْحٌ مِّنْهُ শব্দের অর্থ যদি করা হয় যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র অংশ, তবে جَمِيْعًا مِّنْهُ শব্দের অর্থ করতে হবে আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহ্র অংশ। (নাযুবিল্লাহি মিন যালিক)। অতএব, হযরত ঈসা (আঃ)-এর বিশেষ কোন মর্যাদা সাব্যস্ত হয় না। এ উত্তর শুনে খৃস্টান চিকিৎসক নিরুত্তর হয়ে গেল এবং ইসলাম গ্রহণ করলো।

وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ কোরআন নাযিলের সমসাময়িক কালে খৃস্টানরা যেসব উপদলে বিভক্ত ছিল, তন্মধ্যে ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে তাদের ধর্মবিশ্বাস তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। একদল মনে করতো—মসীহই খোদা। স্বয়ং খোদাই মসীহরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। দ্বিতীয় দল বলতো—মসীহ্ পুত্র। তৃতীয় দলের বিশ্বাস ছিল, তিন সদস্য সমন্বয়ে খোদার একক পরিবার। এ দলটি আবার দু'টি উপদলে বিভক্ত ছিল। এক দলের মতে পিতা, পুত্র ও মরিয়ম এ তিনের সমন্বয়ে এক খোদা। অন্য এক দলের মতে হযরত মরিয়ম (আঃ)-এর পরিবর্তে রূহুল কুদুস পবিত্রাত্মা হযরত জিবরাঈল (আঃ) ছিলেন তিন খোদার একজন।

মোটকথা, খৃস্টানরা হযরত ঈসা মসীহ্ (আঃ)-কে তিনের এক খোদা মনে করতো। তাদের ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য কোরআন করীমে প্রত্যেকটি উপদলকে ভিন্ন ভিন্নভাবে সম্বোধন করা হয়েছে এবং সম্মিলিতভাবেও সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের সামনে স্পষ্ট ও জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, সত্য একটিই। আর তা হল হযরত ঈসা মসীহ (আঃ) তাঁর মাতা হযরত মরিয়মের গর্ভে জন্মগ্রহণকারী একজন মানুষ ও আল্লাহ্ তাআলার সত্য রসূল। এর অতিরিক্ত তাঁর সম্পর্কে যা কিছু বলা বা ধারণা করা হয়, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বাতিল। তাঁর প্রতি ইহুদীদের মত অবজ্ঞা বা ঈর্ষা পোষণ করা অথবা খৃস্টানদের মত অতি ভক্তি প্রদর্শন করা সমভাবে নিন্দনীয় ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

কোরআন মজীদের অসংখ্য আয়াতে একদিকে ইহুদী-খৃস্টানদের পথভ্রষ্টতা দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, অপরদিকে আল্লাহ্ তাআলার দরবারে হযরত ঈসা (আঃ)-এর উচ্চ মর্যাদা ও বিশেষ সম্মানের অধিকারী হওয়ার কথাও জোরালোভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। ফলে অবজ্ঞা ও অতিভক্তি দু'টি পরস্পর বিরোধী ভ্রান্ত মতবাদের মধ্যবর্তী সত্য ও ন্যায়ে সঠিক পথ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا

অর্থাৎ, আসমান ও যমীনে উপর হতে নীচে পর্যন্ত যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টি ও তাঁর বান্দা। অতএব, তাঁর কোন অংশীদার বা পুত্র-পরিজন হতে পারে না। আল্লাহ্ তাআলা একাই সর্বকার্য সম্পাদনকারী এবং সকলের কার্য সম্পাদনের জন্য তিনি একাই যথেষ্ট; অন্য কারো সাহায্য-সহায়তার প্রয়োজন নেই। তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার বা পুত্র-পরিজন থাকতে পারে না।

সারকথা, কোন সৃষ্ট ব্যক্তিরই স্রষ্টার অংশীদার হওয়ার যোগ্যতা নেই। আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র সত্তার জন্য এর অবকাশও নেই, প্রয়োজনও নেই। অতএব, একমাত্র বিবেকবর্জিত, ঈমান হতে বঞ্চিত ব্যক্তি ছাড়া আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্ট কোন জীবকে তাঁর অংশীদার বা পুত্র বলা অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা হারাম ঃ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ আয়াতে ইহুদী-নাসারাগণকে ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করা হয়েছে। غلو শব্দের অর্থ সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া। ইমাম জাস্সাস 'আহ্কামুল-কোরআনে' লিখেছেন ঃ

الغلوفى الدين هو مجاوزة حد الحق فيه

অর্থাৎ, ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার অর্থ তার ন্যায়সঙ্গত সীমা রেখা অতিক্রম করা।

আহলে-কিতাব অর্থাৎ ইহুদী-খৃস্টান উভয় জাতিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, ধর্মের ব্যাপারে কোনরূপ বাড়াবাড়ি করো না। কারণ, এ বাড়াবাড়ির রোগে উভয় জাতিই আক্রান্ত হয়েছে। খৃস্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে। তাঁকে স্বয়ং খোদা, খোদার পুত্র অথবা তিনের এক খোদা বানিয়ে দিয়েছে। অপর দিকে ইহুদীরা তাঁকে অমান্য ও প্রত্যাখ্যান করার দিক দিয়ে বাড়াবাড়ির শিকার হয়েছে। তারা হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্র নবী হিসেবে স্বীকার করেনি। বরং তাঁর মাতা হযরত মরিয়ম (আঃ)-এর উপর মারাত্মক অপবাদ আরোপ করেছে এবং তাঁর নিন্দাবাদ করেছে।

ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও সীমা লঙ্ঘনের কারণে ইহুদী ও খৃষ্টানদের গোমরাহী ও ধ্বংস হওয়ার শোচনীয় পরিণতি বার বার প্রত্যক্ষ হয়েছে। তাই হযরত রসূলে করীম (সাঃ) তাঁর প্রিয় উম্মতকে এব্যাপারে সংযত থাকার জন্য সতর্ক করেছেন। মুসনাদে আহমদে হযরত ফারূকে আযম (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

لاتطرونى كما اطرت النصارى عيسى بن مريم فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله

অর্থাৎ, 'তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে এমন অতিরঞ্জিত করোনা, যেমন খৃস্টানরা হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ)-এর ব্যাপারে করেছে। স্মরণ রাখবে যে, আমি আল্লাহ্‌র বান্দা। অতএব, আমাকে আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রসূল বলবে।' বোখারী এবং ইবনে-মাদয়িনী এ হাদীস উল্লেখ করে এর সনদকে সহীহ্ বলেছেন।

সারকথা, আল্লাহ্‌র বান্দা ও মানুষ হিসেবে আমিও অন্য লোকদের সমপর্যায়ের। তবে আমার সবচেয়ে বড় মর্যাদা এই যে, আমি আল্লাহ্‌র রসূল। এরচেয়ে অগ্রসর করে আমাকে আল্লাহ্ তাআলার কোন বিশেষণে বিশেষিত করা বাড়াবাড়ি বৈ নয়। তোমরা ইহুদী-নাসারাদের মত বাড়াবাড়ি করো না। বস্তুতঃ ইহুদী-খৃস্টানরা শুধু নবিগণের ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি করে ক্ষান্ত হয়নি, বরং এটা যখন তাদের স্বভাবে পরিণত হলো, তখন তারা নবিগণের সহচর ও অনুগামীদের ব্যাপারেও অতিরঞ্জিত সব গুণ আরোপ করেছিল। পাদ্রী-পুরোহিতগণকেও তারা নিষ্পাপ মনে করতো। অতঃপর এতটুকু যাচাই করারও প্রয়োজন মনে করতো না যে, তারা সত্যিকারভাবে নবিগণের অনুগত এবং তাঁদের শিক্ষার অনুসারী না শুধু উত্তরাধিকার সূত্রে পণ্ডিত-পুরোহিত রূপে পরিগণিত হন? ফলে পরবর্তীকালে তাদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব এমন পাদ্রী-পুরোহিতদের কুক্ষিগত হয়েছে যারা নিজেরা স্বার্থপর ও পথভ্রষ্ট ছিল এবং অনুসারীদেরকে চরম বিভ্রান্তি ও গোমরাহীর আবর্তে নিক্ষেপ করেছে। ধর্ম-কর্মের নামে তারা অধর্ম-অনাচারে লিপ্ত হয়েছে। কোরআন পাক ঘোষণা করছে ঃ

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

'তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তাদের ধর্মীয় পণ্ডিতগণ ও সন্যাসিগণকে মাবুদের আসনে বসিয়েছিল।' রসূলকে তো খোদা বানিয়েছিলই, রসূলের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার নামে পূর্ববর্তী নবিগণকেও পূজা করা শুরু করেছিল।

এতদ্বারা বোঝা গেল যে, ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা এমন এক মারাত্মক ব্যাধি যা ধর্মের নামেই পূর্ববর্তী ধর্মসমূহের সত্যিকার রূপরেখাকে বিলীন করেছে। তাই আমাদের প্রিয়নবী (সাঃ) স্বীয় উম্মতকে এহেন ভয়াবহ মহামারীর কবল হতে রক্ষা করার জন্য পূর্ণ সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, হজ্বের সময় 'রমীয়ে-জামারাহ্' অর্থাৎ, কঙ্কর নিক্ষেপের জন্য রসূলুল্লাহ্ হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ)-কে কঙ্কর আনতে আদেশ করলেন। তিনি মাঝারী আকারের পাথরকুচি নিয়ে এলে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) অত্যন্ত পছন্দ করলেন এবং বললেন— بمثلهن অর্থাৎ, এ ধরনের মাঝারী আকারের কঙ্কর নিক্ষেপ করাই পছন্দনীয়। বাক্যটি তিনি দুবার বললেন। অতঃপর আরো বললেন ঃ

اياكم والغلوفى الدين فانما هلك من قبلكم بالغلو فى دينهم

অর্থাৎ, ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি থেকে দূরে থেকো। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতসমূহ তাদের ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার কারণেই ধ্বংস হয়েছে। এ হাদীস দ্বারা কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল জানা গেল।

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল ঃ প্রথমতঃ হুরে সময় যে কঙ্কর নিক্ষেপ করা হয় তা মাঝারী আকারের হওয়াই সুন্নত। অতি ক্ষুদ্র বা বড় পাথর নিক্ষেপ করা সুন্নতের পরিপন্থী। বড় বড় প্রস্তর নিক্ষেপ করা ধর্মের কাজে বাড়াবাড়ির শামিল।

দ্বিতীয়ত ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) স্বীয় কথা ও কাজের মাধ্যমে যে কাজের যে সীমারেখা শিক্ষা দিয়েছেন, সেটিই শরীয়তের নির্ধারিত সীমা। এ অতিক্রম করাই বাড়াবাড়ি রূপে পরিগণিত হবে।

তৃতীয়ত ঃ – যে কোন কাজে সুন্নাহ সম্মত সীমারেখা অতিক্রম করাই বাড়াবাড়ি রূপে বিচেনা করতে হবে।

দুনিয়ার মহব্বতের রূপরেখা ঃ পার্থিব ধন-সম্পদ, আরাম-আয়েশের প্রতি প্রয়োজনাতিরিক্ত আকাংখা ও লোভ-লালসা ইসলামের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। এটা পরিত্যাগ করার জন্য কোরআন পাকে বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। দুনিয়ার মহব্বত বা পার্থিব মোহ সম্পর্কে সতর্ক করার সাথে সাথে রসূলে করীম (সাঃ) স্বীয় কথা ও কার্য দ্বারা তার সীমারেখাও নির্ধারণ করেছেন। যেমন, বিবাহ করাকে তিনি নিজের সুন্নত বলে ঘোষণা করেছেন, বিবাহ করার জন্য উৎসাহিত করেছে, সন্তান জন্মদানের উপকারিতা বুঝিয়েছেন, পরিবার-পরিজনের সাথে সদ্ব্যবহার ও তাদের ন্যায্য অধিকার পূরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, নিজের ও পরিবারবর্গের জীবিকা নির্বাহের জন্য উপার্জন করাকে 'ফরিযাতুন বা'দাল ফরিযা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। ব্যবসায়, কৃষিকার্য, শিল্প-কর্ম, হস্তশিল্প ও মজদুরীর জন্য প্রেরণা যুগিয়েছেন। অতএব, এর কোনটাই দুনিয়ার মহব্বতের গণ্ডীর মধ্যে পড়ে না। ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাকে নবুওয়তের দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করে রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বীয় প্রচেষ্টায় সমগ্র আরব উপ-দ্বীপে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের পত্তন করেন। অতঃপর খোলাফায়ে-রাশেদীনের সুবর্ণ যুগে সে রাষ্ট্রের এলাকা বহু দূর-দুরান্তে বিস্তৃত হয়েছিল, অথচ তাঁদের অন্তরে দুনিয়ার কোন মোহই ছিল না। এতদ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, প্রয়োজন অনুসারে এসব করা নিন্দনীয় নয়।

ইহুদী ও খৃস্টানরা এ তত্ত্বটি অনুবাধন করতে অপারক হওয়ায় সন্যাস ব্রত গ্রহণ করেছে। তাদের এ ভ্রান্তি খণ্ডন করে আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেন ঃ

وَرَهْبَانِيَّةً ِۨابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا

অর্থাৎ, তারা নিজেদের পক্ষ থেকে সন্যাস ব্রত গ্রহণ করেছে। যা আমি তাদের প্রতি আরোপ করিনি। অতঃপর তারা তা যথাযথভাবে বজায় রাখেনি।

সুন্নত ও বেদাতের সীমারেখা ঃ এবাদত, লেন-দেন, আচার-ব্যবহার তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে রসূলে পাক (সাঃ) স্বীয় কথা ও কাজের মাধ্যমে মধ্যপন্থা নির্দেশ করেছেন। তার চেয়ে পেছনে অবস্থান যেমন, অবাঞ্ছনীয়, তেমনি অগ্রসর হওয়াও অমার্জনীয়। এ জন্য রসূলুল্লাহ (সাঃ) সর্বপ্রকার বেদাতকে কঠোরভাবে প্রতিরোধ করেছেন। তিনি এরশাদ করেছেন كل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار অর্থাৎ, প্রত্যেকটি বেদাত

গোমরাহী আর প্রত্যেকটি গোমরাহীর পরিণামই জাহান্নাম। রসূলে মকবূল (সাঃ)-এর কথা বা কার্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায় না, এরূপ কোন বিষয়কে সওয়াবের কাজ মনে করাই বেদাত।

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলবী (রাহঃ) লিখছেন ঃ 'ইসলামের দৃষ্টিতে বেদাতকে চরম অপরাধ এ জন্য বলা হয়েছে যে, এটাই দ্বীন ও শরীয়তকে বিকৃত করার প্রধান হাতিয়ার ও চিরাচরিত পন্থা। পূর্ববর্তী উম্মতগণেরও প্রধান ব্যাধি ছিল যে, তারা নিজেদের নবী ও রসূলগণের মৌলিক শিক্ষার উপর নিজেদের পক্ষ থেকে পরিবর্তন করেছিল। এমনকি শেষ পর্যন্ত তারা কিকি বর্ধিত করেছে আর আসল বিষয়টা কি ছিল, তা জানারও কোন উপায় ছিল না।

দ্বীনকে বিকৃত করার কারণ ও পন্থাসমূহ কি কি, কোনও গুপ্তপথে যাতে এ মহামারী উম্মতে-মোহাম্মদীর মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে না পারে, তজ্জন্য ইসলামী শরীয়তে কিভাবে প্রতিটি পথে সতর্ক ও শক্তিশালী প্রহরা মোতায়েন করা হয়েছে, সে সম্পর্কে হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলবী (রাহঃ) তদীয় 'হুজ্জাতুল্লাহ্ হিলবালেগাহ' কিতাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ধর্মীয় নেতাদের প্রতি ভক্তি ও সম্মানের মধ্যপন্থা ঃ উক্ত কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম কারণ হলো ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, নবী-করীম (সাঃ)-এর কঠোর হুঁশিয়ারী এবং শরীয়তের কঠিন বিধি-নিষেধ সত্ত্বেও বর্তমান মুসলিম সমাজ ধর্মীয় ব্যাপারে বাড়াবাড়ির শিকারে পরিণত হয়েছে। দ্বীনের প্রতিটি শাখায় এই লক্ষণ সুস্পষ্ট ও উদ্বেগজনক। দ্বীন ও ঈমানের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর ও মারাত্মক হচ্ছে ধর্মীয় নেতাদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার আতিশয্য অথবা অবহেলা ও অবজ্ঞার মনোবৃত্তি। একদল মনে করছে যে, ধর্মীয় আলেম-ওলামা, পীর-বুযুর্গাণের কোন প্রয়োজনই নেই; আল্লাহ্র কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট। কারণ, তারাও মানুষ আমরাও মানুষ। এমনোভাবাপন্ন কোন কোন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি আরবী ভাষায়ও অনভিজ্ঞ, কোরআনের হাকীকত ও নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-ও সাহাবায়ে-কেরামের বর্ণিত ব্যাখ্যা ও তফসীর সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না হওয়া সত্ত্বেও, কয়েকখানি অনুবাদ পুস্তক পাঠ করেই নিজেকে কোরআনের সমঝদার মনে করে বসেছে। স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তাঁর প্রত্যক্ষ শাগরেদ অর্থাৎ, সাহাবায়ে-কেরাম কর্তৃক বর্ণিত ব্যাখা ও তফসীরের তোয়াক্কা না করে নিজেদের কল্পনা-প্রসূত মনগড়া ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেছে। অথচ তারা চিন্তা করে না যে, ওস্তাদ ছাড়া শুধু কিতাবই যদি যথেষ্ট হতো, তবে আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কোরআনের লিখিত কপি প্রত্যেকের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে সক্ষম ছিলেন—রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে ওস্তাদরূপে প্রেরণের আবশ্যক হতো না। একথা শুধু আল্লাহ্র কিতাবের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং দুনিয়ার যে কোন বিষয় বা শাস্ত্রের বই পুস্তক বা অনুবাদ পাঠ করেই কেউ উক্ত শাস্ত্রে পারদর্শী হতে পারে না। শুধু ডাক্তারী বই পড়েই আজ পর্যন্ত কেউ বড় ডাক্তার হতে পারে নাই। প্রকৌশল বিদ্যার বই অধ্যয়ন করেই কোন পারদর্শী প্রকৌশলী হয়েছে বলে শুনা যায় না। এমনকি দর্জিবিদ্যা বা পাক প্রণালীর শুধু বই পড়ে কোন সুদক্ষ দর্জী বা বাবুর্চি হতেও দেখা যায় না। বরং এসব ক্ষেত্রে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সর্বজন স্বীকৃত। অথচ তারা কোরআন-হাদীসকে এত হাল্কা মনে করেছে যে, এগুলো বুঝার জন্য কোন ওস্তাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না। এটা সত্যই পরিতাপের বিষয়।

অনুরূপভাবে একদল শিক্ষিত লোক গড্ডালিকা প্রবাহে মেতে উঠেছে যে, কোরআন পাক বুঝার জন্য তর্জমা অধ্যয়নই যথেষ্ট। পূর্ববর্তী মনীষিগণের তফসীর ও ব্যাখ্যার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা বা তাঁদের অনুসরণ-অনুকরণ করার আদৌ কোন প্রয়োজন নাই। আদতে এটাও এক প্রকার বাড়াবাড়ি বা অনধিকার চর্চা।

অপরদিকে বহু মুসলমান অন্ধ ভক্তিজনিত রোগে আক্রান্ত। যাকে তাদের পছন্দ হয়েছে, তাকেই নেতা সাব্যস্ত করে অন্ধভাবে অনুসরণ করেছে। তারা কখনো এতটুকু যাচাই করে দেখে না যে, আমরা যাকে নেতারূপে অনুসরণ করছি তিনি এলেম-আমল, এছলাহ ও পরহেযগারীর মাপকাঠিতে টিকেন কিনা? তারা যে শিক্ষা দিচ্ছেন তা কোরআন ও সুন্নাহ্ মোতাবেক কিনা? প্রকৃতপক্ষে এহেন অন্ধভক্তিও বাড়াবাড়িরই নামান্তর।

বাড়াবাড়ির উভয় পথ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ইসলামী শরীয়তের পথ-নির্দেশ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্র কিতাব আল্লাহ্ ওয়ালা লোকদের কাছে বুঝতে হবে এবং আল্লাহ্র কিতাব দ্বারা আল্লাহ্ ওয়ালা লোকদের চিনতে হবে। অর্থাৎ, প্রথমে কোরআন ও হাদীসের নির্ধারিত নিরিখের আলোকে খাঁটি আল্লাহ্ ওয়ালাগণকে চিনে নাও। অতঃপর দেখ তাঁরা কোরআন ও হাদীসের চর্চায় সদা নিমগ্ন এবং তাদের জীবনধারাও কোরআন-হাদীসের রংয়ে রঞ্জিত কিনা। অতঃপর কোরআন ও হাদীসের সব জটিল প্রশ্নের সমাধানে তাঁদের অভিমত ও সিদ্ধান্তকে নিজের বুঝ-ব্যবস্থার উপর প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দিয়ে তার অনুসরণ করতে হবে।

আল্লাহ্র বান্দা হওয়াই সর্বোচ্চ মর্যাদার বিষয় ঃ لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ – অর্থাৎ, হযরত ঈসা (আঃ) স্বয়ং এবং আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতাগণ কখনো আল্লাহ্র বান্দারূপে পরিচিত হতে লজ্জা বা অপমান বোধ করেন না। কারণ, আল্লাহ্র দাসত্ব ও গোলামি করা, তার এবাদত-বন্দেগী করা, আদেশ-নিষেধ পালন করা অতি মর্যাদা, গৌরব ও সৌভাগ্যের বিষয়। হযরত ঈসা মসীহ (আঃ) ও হযরত জিবরাঈল (আঃ) প্রমুখ বিশিষ্ট ফেরেশতাগণ এ সম্পর্কে উত্তমরূপে অবহিত রয়েছেন। তাই এতে তাঁদের কোন লজ্জা নেই। আসলে আল্লাহ্ তাআলা ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব বা গোলামি করাই লজ্জা ও অমর্যাদার কাজ। যেমন, খৃষ্টানরা হযরত ঈসা মসীহ (আঃ)-কে আল্লাহ্র পুত্র ও অন্যতম উপাস্য সাব্যস্ত করেছে এবং মুশরেকরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্র কন্যা ও দেবী সাব্যস্ত করে তাদের মূর্তি তৈরী করে পূজা-অর্চনা শুরু করেছে। অতএব, তাদের জন্য চিরস্থায়ী শাস্তি ও অপমান অবধারিত রয়েছে।— (ফাওয়ায়েদে-উসমানী)

قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ 'বুরহান' শব্দের আভিধানিক অর্থ অকাট্য দলীল-প্রমাণ। এ আয়াতে এর দ্বারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র সত্তা ও মহান ব্যক্তিত্বকে বোঝানো হয়েছে।— (তফসীরে রূহুল-মা'আনী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মহান ব্যক্তিত্বের জন্য 'বুরহান' শব্দ প্রয়োগ করার তাৎপর্য এই যে, তাঁর বরকতময় সত্তা, অনুপম চরিত্র মাধুর্য, অপূর্ব মো'জেযাসমূহ, তাঁর প্রতি বিস্ময়কর কিতাব আল-কোরআন অবতীর্ণ হওয়া ইত্যাদি তাঁর রেসালতের অকাট্য দলীল ও প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যার পরে আর কোন সাক্ষ্য-প্রমাণের আবশ্যক হয় না। অতএব, তাঁর মহান ব্যক্তিত্বই তাঁর সত্যতার অকাট্য প্রমাণ।

يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۭ اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ
لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ
اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۭ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا
تَرَكَ ۭ وَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۗءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْاُنْثَيَيْنِ ۭ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۭ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ١٧٦

سُوْرَةُ الْمَآئِدَةِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ مِائَةٌ وَعِشْرُوْنَ اٰيَةً وَسِتَّ عَشْرَةَ رُكُوْعًا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۭ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ
الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ۭ اِنَّ اللّٰهَ
يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ١ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَاۗىِٕرَ اللّٰهِ وَلَا
الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَاۗىِٕدَ وَلَآ اٰۗمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ
يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۭ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۭ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ
تَعْتَدُوْا ۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَي الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۠ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَي الْاِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۠ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ٢

(১৭৬) মানুষ আপনার নিকট ফতোয়া জানতে চায়—অতএব, আপনি বলে দিন, আল্লাহ তোমাদিগকে 'কালালাহ' –এর মীরাস সংক্রান্ত সুস্পষ্ট নির্দেশ বাতলে দিচ্ছেন; যদি কোন পুরুষ মারা যায় এবং তার কোন সন্তানাদি না থাকে এবং এক বোন থাকে, তবে সে পাবে তার পরিত্যাক্ত সম্পত্তির অর্ধেক অংশ এবং সে যদি নিঃসন্তান হয়, তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে। তা দুই বোন থাকলে তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ। পক্ষান্তরে যদি ভাই ও বোন উভয়ই থাকে, তবে একজন পুরুষের অংশ দুজন নারীর সমান। তোমরা বিভ্রান্ত হবে বলে আল্লাহ্ তোমাদিগকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন সর্ব বিষয়ে পরিজ্ঞাত।

সূরাতুল - মায়েদাহ
মদীনায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত, ১২০

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(১) মুমিনগণ, তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর। তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে; যা তোমাদের কাছে বিবৃত হবে তা ব্যতীত। কিন্তু এহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় শিকারকে হালাল মনে করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা আলা যা ইচ্ছা করেন, নির্দেশ দেন। (২) হে মুমিনগণ! হালাল মনে করো না আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ এবং সম্মানিত মাসসমূহকে এবং হরমে কুরবানীর জন্যে নির্দিষ্ট জন্তুকে এবং ঐসব জন্তুকে, যাদের গলায় কন্ঠাভরণ রয়েছে এবং ঐসব লোককে, যারা সম্মানিত গৃহ অভিমুখে যাচ্ছে, যারা স্বীয় পালনকর্তার অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে। যখন তোমরা এহ্‌রাম থেকে বের হয়ে আস, তখন শিকার কর। যারা পবিত্র মসজিদ থেকে তোমাদেরকে বাধা প্রদান করেছিল, সেই সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত না করে। সৎকর্ম ও খোদভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা আলা কঠোর শাস্তিদাতা।

আলোচ্য আয়াতে نور (নূর) শব্দ দ্বারা কোরআন মজীদকে বোঝানো হয়েছে।—(রূহুল-মা'আনী) যেমন, সূরায়ে মায়েদার আয়াত قَدْ جَاۗءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ অর্থাৎ, তোমাদের কাছে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এক উজ্জ্বল আলো তথা এক প্রকৃষ্ট কিতাব অর্থাৎ, কোরআন এসেছে।—(বয়ানুল কোরআন)

আবার নূর অর্থ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং কিতাব অর্থ আল-কোরআনও হতে পারে।—(রূহুল মা'আনী) তবে তার অর্থ এই নয় যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মানবীয় দৈহিকতা থেকে পবিত্র শুধু নূর ছিলেন।

সূরা আন-নিসা সমাপ্ত

সূরাতুল মায়েদাহ

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ এখানে আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ এবং 'কালালাহ্‌র' হুকুম বর্ণনার মাধ্যমে কয়েকটি বিষয় জানা গেল।

প্রথমত ঃ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ বলার পর দৃষ্টান্ত স্বরূপ আহলে-কিতাবদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। তদ্রূপ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ আয়াতে রসূলে করীম (সাঃ) -এর সাহায্যে-কেরামের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে যাতে করে ওহী হতে যারা পরাঙ্মুখ তাদের পথভ্রষ্টতা ও সর্বনাশ এবং ওহীর আনুগত্য ও অনুসরণকারীদের সাফল্য ও সৌভাগ্য সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়।

দ্বিতীয়ত ঃ জানা গেল যে, আহলে-কিতাবরা আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র সত্তার জন্য অংশীদার ও পুত্র সাব্যস্ত করার মত হীন মানসিকতাকে নিজেদের ঈমানের অঙ্গ বানিয়েছে। হঠকারিতার সাথে আল্লাহ্‌র ওহীর বিরুদ্ধাচরণ করেছে। অপর দিকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর সাহায্যে–কেরাম ধর্মীয় মূলনীতি ও এবাদত তো দূরের কথা লেন-দেন, আচার-ব্যবহার, বিবাহ-শাদী এমনকি মীরাস বন্টনের মত ব্যাপারেও নিজেদের বুদ্ধি-বৃত্তিকে যথেষ্ট মনে করতেন না, বরং সর্ব ব্যাপারেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর দিকে তাকিয়ে থাকতেন, ওহীর প্রতীক্ষা করতেন। যদি একবারে সান্ত্বনা না পেতেন, তবে আবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর সমীপে হাযির হয়ে জানতে চাইতেন।

তৃতীয়ত ঃ আরো বোঝা গেল যে, হযরত সাইয়্যেদুল-মুরসালীন (সাঃ) ওহীর হুকুম ছাড়া নিজের পক্ষ থেকে কোন আদেশ জারি করতেন না। যদি কোন ব্যাপারে পূর্ববর্তী কোন ওহী না থাকতো, তবে তিনি ওহীর প্রতীক্ষা করতেন। এখানে আরো ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আহ্‌লে-কিতাবদের আবদার অনুসারে ওহী এক সাথে নাযিল না হয়ে যথাসময়ে অল্প-অল্প নাযিল হওয়া অতি উত্তম ছিল। কারণ, এমতাবস্থায় যে কোন ব্যক্তি নিজ নিজ প্রয়োজন অনুসারে প্রশ্ন করার সুযোগ পায় এবং ওহীর মাধ্যমে জবাব জানতে পারে। যেমন, আর আয়াতে এবং কোরআন মজীদের আরো বহু আয়াতে তার নজীর দেখতে পাওয়া যায়।

এ ব্যবস্থাটি অধিক উপকারী ও কার্যকরী। তাছাড়া স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক বান্দাকে স্মরণ ও সম্বোধন করা বন্দার জন্য অতি সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয় যা পূর্ববর্তী উম্মতগণ হাসিল করতে পারেনি।

وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

যে কোন সাহাবীর কল্যাণার্থ বা যার প্রশ্নের উত্তরে কোন আয়াত নাযিল হয়েছে, উক্ত আয়াত তাঁকে মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত করেছে। তার মতভেদ হলে যার বক্তব্য অনুসারে ওহী নাযিল হয়েছে, কেয়ামত পর্যন্ত চিরদিন তাঁর সুনাম ও সুখ্যাতি বজায় থাকবে। যাহোক, 'কালালাহ' সম্পর্কে প্রশ্ন ও উত্তর উল্লেখ করে উপরোক্ত সমাধানসমূহের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে।—(ফাওয়ায়েদে-ওসমানী)

শানে নুযূল ঃ এটি সূরা মায়েদার প্রথম আয়াত। সূরা মায়েদা সর্বসম্মতিক্রমে মদীনায় অবতীর্ণ। মদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যেও এটি শেষ দিককার সূরা। এমনকি, কেউ কেউ একে কোরআন মজীদের সর্বশেষ সূরাও বলেছেন। মুসনাদে-আহ্‌মদে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) ও আসমা বিনতে এয়াযীদের (রাঃ) বাচনিক বর্ণিত আছে, সূরা মায়েদা যে সময় অবতীর্ণ হয়, সে সময় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সফরে 'আযবা' নামীয় উষ্ট্রীর পিঠে সওয়ার ছিলেন। সাধারণতঃ ওহী অবতরণের সময় যেরূপ অসাধারণ ওজন ও বোঝা অনুভূত হতো, তখনও যথারীতি তা অনুভূত হয়েছিল। এমনকি ওজনের চাপে উষ্ট্রী অক্ষম হয়ে পড়লে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নীচে নেমে আসেন। কোন কোন রেওয়ায়েত দৃষ্টে বোঝা যায় যে, এটি ছিল বিদায় হজ্বের সফর। বিদায় হজ্ব নবম হিজরীর ঘটনা। এ হজ্ব থেকে ফিরে আসার পর হুযূর (সাঃ) প্রায় আশি দিন জীবিত ছিলেন। ইবনে হাব্বান 'বাহরে-মুহীত' গ্রন্থে বলেন ঃ সূরা মায়েদার কিয়দংশ হোদায়বিয়ার সফরে, কিয়দংশ মক্কা বিজয়ের সফরে এবং কিয়দংশ বিদায় হজ্বের সফরে অবতীর্ণ হয়। এতে বোঝা যায় যে, এ সূরাটি সর্বশেষ সূরা না হলেও শেষ পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছে।

রুহুল-মা'আনী গ্রন্থে আবু ওবায়দাহ্ হযরত হামযা ইবনে হাবীব এবং আতিয়্যা ইবনে কায়স বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

المائدة من آخر القرآن تنزيلا فاحلوا حلالها وحرموا حرامها

অর্থাৎ, 'সূরা মায়েদাহ্ কোরআন অবতরণের শেষ পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে যা হালাল করা হয়েছে, সেগুলোকে চিরকালের জন্যে হালাল এবং যা হারাম করা হয়েছে, সেগুলোকে চিরকালের জন্যে হারাম মনে করো।'

ইবনে-কাসীরে এমনি ধরনের একটি রেওয়ায়েত হযরত জুবায়ের ইবনে নুফায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে, তিনি একবার হজ্বের পর হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলে তিনি বললেন ঃ জুবায়ের, তুমি কি সূরা মায়েদাহ্ পাঠ কর? তিনি আরয করলেন, জী-হাঁ, পাঠ করি। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন ঃ এটি কোরআন পাকের সর্বশেষ সূরা। এতে হালাল ও হারামের যেসব বিধি-বিধান বর্ণিত আছে, তা অটল। এগুলো রহিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কাজেই এগুলোর প্রতি বিশেষ যত্নবান থেকো।

সূরা মায়েদায়ও সূরা নেসার মত বিভিন্ন বিষয়ের মাসআলা-মাসায়েল, লেন-দেন, পারস্পরিক চুক্তি-অঙ্গীকার ইত্যাদির বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। এ কারণেই রুহুল-মা'আনীর গ্রন্থকার বলেন ঃ বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে সূরা বাক্বারা ও সূরা আলে-ইমরান অভিন্ন। কেননা, এ দু'টি সূরায় প্রধানতঃ মৌলিক বিধি-বিধান ও আকায়েদ, যথা, তওহীদ, রেসালত, কিয়ামত ইত্যাদির বর্ণনা উল্লেখিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ও বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে সূরা নিসা ও সূরা মায়েদাহ বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে অভিন্ন। কেননা, এ দু'টি সূরায় প্রধানতঃ বিভিন্ন বিধি-বিধানের বিস্তারিত আলোচনা স্থান লাভ করেছে এবং মৌলিক বিধি-বিধান প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত হয়েছে। সূরা নিসায় পারস্পরিক লেন-দেন ও বন্দার হকের উপর জোর দেয়া হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর হক, এতীমের হক, পিতা-মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য অধিকারের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে। সূরা মায়েদার প্রথম আয়াতেও এসব লেন-দেন ও চুক্তি -অঙ্গীকার মেনে চলা ও পূর্ণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমনঃ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ হে মুমিনগণ, তোমরা ওয়াদা —অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এ কারণেই সূরা মায়েদার অপর নাম সূরা ওকূদ। অর্থাৎ, ওয়াদা-অঙ্গীকারের সূরা।-(বাহরে-মুহীত)

চুক্তি-অঙ্গীকার ও লেন-দেনের ক্ষেত্রে এ সূরাটি বিশেষ করে এর প্রথম আয়াতটি সবিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আমর ইবনে হাযম (রাঃ)-কে ঐ আমলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন এবং একটি ফরমান লিখে তাঁর হাতে অর্পণ করেন, তখন এ ফরমানের শিরোনামে উল্লেখিত আয়াতটিও লিপিবদ্ধ করে দেন।

এ সূরার প্রথম আয়াতের প্রথম বাক্যটি এত ব্যাপক অর্থবোধক যে, এর ব্যাখ্যায় হাজারো পৃষ্ঠা লেখা যায় এবং লেখা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে ঃ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! স্বীয় চুক্তি-অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এতে প্রথমে يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলে সম্বোধন করে বিষয়বস্তুর গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, এতে যে নির্দেশ রয়েছে, তা সাক্ষাৎ ঈমানের দাবী। এরপর বলা হয়েছেঃ اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ عقود - عقد - শব্দের বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ বাঁধা, আবদ্ধ করা। চুক্তিতে যেহেতু দুই ব্যক্তি অথবা দুই দল আবদ্ধ হয়, এজন্য এটাকেও عقد বলা হয়। এভাবে عقود এর অর্থ হয় عهود অর্থাৎ, চুক্তি ও অঙ্গীকার।

খ্যাতনামা তফসীরবিদ ইবনে-জরীর উপরোক্ত অর্থে তফসীরবিদ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের 'ইজমা' (ঐকমত্য) বর্ণনা করেছেন। ইমাম জাস্‌সাস বলেনঃ দুই পক্ষ যদি ভবিষ্যতে কোন কাজ করা অথবা না করার বাধ্য-বাধকতায় একমত হয়ে যায়, তবে তাকেই عهد, عقد ও معاهد বলা হয়। আমাদের পরিভাষায় একেই চুক্তি বলা হয়। অতএব, উপরোক্ত বাক্যের সারমর্ম এই যে, পারস্পরিক চুক্তি পূর্ণ করাকে জরুরী ও অপরিহার্য মনে কর।

এখন দেখতে হবে আয়াতে চুক্তি বলে কোন্ ধরনের চুক্তিকে বুঝানো হয়েছে? এ ব্যাপারে তফসীরবিদগণের বাহ্যতঃ বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। কেউ কেউ বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা বান্দাদের কাছ থেকে ঈমান ও এবাদত সম্পর্কিত যে সব অঙ্গীকার নিয়েছেন অথবা আল্লাহ্ তাআলা বান্দাদের কাছ থেকে স্বীয় নাযিলকৃত বিধি-বিধান হালাল ও হারাম সম্পর্কিত যেসব অঙ্গীকার নিয়েছেন, আয়াতে সেগুলোকেই বুঝানো হয়েছে। এ উক্তি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে।

তফসীরবিদ ইবনে সাআদ ও যায়দ ইবনে আসলাম বলেন ঃ এখানে ঐসব চুক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যা মানুষ পরস্পরে একে অন্যের সাথে সম্পাদন করে। যেমন, বিবাহ-শাদী ও ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি ইত্যাদি।

কেউ কেউ বলেন ঃ এখানে ঐসব শপথ ও অঙ্গীকারকে বুঝানো হয়েছে যা জাহেলিয়াত যুগে একজন অন্যজনের কাছ থেকে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার ক্ষেত্রে সম্পাদন করতো। মুজাহিদ, রবী, কাতাদাহ্

প্রমুখ তফসীরবিদগণও একথাই বলেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ সব উক্তির মধ্যে কোন পরস্পরবিরোধিতা নাই। অতএব, উপরোক্ত সব চুক্তি ও অঙ্গীকারই عقود শব্দের অন্তর্ভুক্ত এবং কোরআন সবগুলোই পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছে।

এ কারণেই ইমাম রাগেব বলেন ঃ চুক্তির যত প্রকার রয়েছে, সবই এ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর তিনি বলেন ঃ এর প্রাথমিক প্রকার তিনটি। (এক)–পালনকর্তার সাথে মানুষের অঙ্গীকার। উদাহরণতঃ ঈমান ও এবাদতের অঙ্গীকার অথবা হারাম ও হালাল মেনে চলার অঙ্গীকার। (দুই)– নিজের সাথে মানুষের অঙ্গীকার। যেমন, নিজ যিম্মায় কোন বস্তুর মান্নত মানা অথবা শপথ করে কোন কাজ নিজের উপর জরুরী করে নেওয়া। (তিন) – মানুষের সাথে মানুষের সম্পাদিত চুক্তি। এছাড়া সে সব চুক্তিও এর অন্তর্ভুক্ত, যা দুই ব্যক্তি, দুই দল বা দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত হয়।

বিভিন্ন সরকারের আন্তর্জাতিক চুক্তি অথবা পারস্পরিক সমঝোতা, বিভিন্ন দলের পারস্পরিক অঙ্গীকার এবং দুই ব্যক্তির মধ্যকার সর্বপ্রকার লেন–দেন, বিবাহ, ব্যবসা, শেয়ার, ইজারা ইত্যাদিতে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে যে সব বৈধ শর্ত স্থির করা হয়, আলোচ্য আয়াতদৃষ্টে তা মেনে চলা প্রত্যেক পক্ষের অবশ্য কর্তব্য। 'বৈধ' শব্দটি প্রয়োগ করার কারণ এই যে, শরীয়ত বিরোধী শর্ত আরোপ করা এবং তা গ্রহণ করা কারও জন্যে বৈধ নয়।

অতঃপর বলা হয়েছে ঃ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ যেসব জীব–জন্তুকে সাধারণভাবে নির্বোধ মনে করা হয়, সেগুলোকে بهيمة (অস্পষ্ট প্রাণী) বলা হয়। কেননা, মানুষ অভ্যাসগতভাবে তাদের ভাষা বুঝে না। ফলে তাদের বক্তব্য مبهم তথা অস্পষ্ট থেকে যায়। ইমাম শা'রানী বলেন ঃ সাধারণ লোকের ধারণা অনুযায়ী এসব জন্তুকে بهيمة বলার কারণ এটা নয় যে, তাদের বুদ্ধি নাই এবং বুদ্ধির বিষয়বস্তু তাদের কাছে অস্পষ্ট থেকে যায়; বরং প্রকৃত সত্য হল এই যে, কোন প্রাণীই বুদ্ধি ও অনুভূতিহীন নয়, এমনকি কোন বৃক্ষ এবং প্রস্তরও নয়। তবে এদের ততটুকু বুদ্ধি নাই, যতটুকু মানুষের রয়েছে।

انعام — শব্দটি نعم এর বহুবচন। এর অর্থ পালিত পশু। যেমন, উট, গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি। সূরা আনআমে এদের আটটি প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে। এদের সবাইকে انعام বলা হয়। بهيمة শব্দের ব্যাপকতাকে انعام শব্দ এসে সংকুচিত করে দিয়েছে। এখন আয়াতের অর্থ দাঁড়িয়েছে এই যে, গৃহপালিত পশু আট প্রকার তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, عقود শব্দ বলে যাবতীয় চুক্তি–অঙ্গীকার বুঝানো হয়েছে। তন্মধ্যে একটি ছিল ঐ অঙ্গীকার, যা আল্লাহ্ তাআলা হালাল ও হারাম মেনে চলার ব্যাপারে বান্দার কাছ থেকে নিয়েছেন। আলোচ্য বাক্যে এই বিশেষ অঙ্গীকারটিই বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের জন্যে উট, ছাগল, গরু, মহিষ ইত্যাদিকে হালাল করে দিয়েছেন। শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী তোমরা এগুলোকে যবেহ্ করে খেতে পার।

আয়াতের প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ — অর্থাৎ, হে মুমিনগণ, আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর অবমাননা করোনা। এখানে شعائر শব্দটি شعيرة শব্দের বহুবচন। এর অর্থ চিহ্ন। যেসব অনুভূত ও প্রত্যক্ষ ক্রিয়াকর্মকে সাধারণের পরিভাষায় মুসলমান হওয়ার চিহ্নরূপে গণ্য করা হয়, সেগুলোকে شعائر اسلام তথা 'ইসলামের নিদর্শনাবলী' বলা হয়। যেমন, নামায, আযান, হজ্ব, সুন্নতী দাঁড়ি ইত্যাদি। আয়াতে উল্লেখিত 'আল্লাহ্র নিদর্শনাবলী'র ব্যাখ্যা বিভিন্ন ভাষায় বর্ণিত আছে। কিন্তু হযরত হাসান বছরী ও আতা (রাঃ) থেকে বর্ণিত বাহ্রে–মুহীত ও রূহুল–মাআনী গ্রন্থে উল্লেখিত ব্যাখ্যাটিই পরিস্কার ও সহজবোধ্য। ইমাম জাসসাস এ ব্যাখ্যাটিকে এ সম্পর্কিত সব উক্তির নির্যাস বলে আখ্যায়িত করেছেন। ব্যাখ্যাটি এই ঃ আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর অর্থ সব শরীয়ত এবং ধর্মের নির্ধারিত ওয়াজেব, ফরয ও এদের সীমা।

আলোচ্য আয়াতে لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ বলার সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর অবমাননা করো না। আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর এক অবমাননা এই যে, মূলতঃই এসব বিধি–বিধানকে উপেক্ষা করে চলা। প্রথমতঃ এসব বিধি–বিধানকে উপেক্ষা করে চলা। দ্বিতীয়তঃ এসব বিধি–বিধানকে অসম্পূর্ণভাবে পালন করা এবং তৃতীয়তঃ নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া। আয়াতে এ তিন প্রকার অবমাননাকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কোরআন পাক এ নির্দেশটিই শব্দান্তরে এভাবে বর্ণনা করেছে ঃ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ অর্থাৎ , যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তা অন্তরের খোদা–ভীতিরই লক্ষণ। আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যে কিছু বিবরণ প্রদান করা হয়েছে।

বলা হয়েছে ঃ

وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا

অর্থাৎ, পবিত্র মাসসমূহে যুদ্ধ–বিগ্রহ করে এগুলোর অবমাননা করো না। পবিত্র মাস হচ্ছে শাওয়াল, জিলহজ্ব ও রজব। এসব মাসে যুদ্ধ–বিগ্রহ করা শরীয়তের আইনে অবৈধ ছিল। সাধারণ আলেমগণের মতে পরবর্তী কালে এ নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে। এছাড়া হরমে কুরবানী করার জন্তু বিশেষতঃ যেসব জন্তুকে গলায় কুরবানীর চিহ্নস্বরূপ কন্ঠাভরণ পরানো হয়েছে, সেগুলোর অবমাননা করো না। এসব জন্তুর অবমাননার এক পন্থা হচ্ছে এদের হরম পর্যন্ত পৌছতে না দেয়া অথবা ছিনিয়ে নেয়া। দ্বিতীয় এই যে, এগুলো কুরবানীর পরিবর্তে অন্য কোন কাজে নিয়োজিত করা। যেমন, আরোহন করা অথবা দুগ্ধ লাভ করা ইত্যাদি। আয়াত এসব পন্থাকেই অবৈধ করে দিয়েছে।

এছাড়া ঐসব লোকেরও অবমাননা করোনা, যারা হজ্বের জন্যে পবিত্র মসজিদের উদ্দেশে গৃহত্যাগ করেছে। এ সফরে তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বীয় পালনকর্তার কৃপা ও সন্তুষ্টি অর্জন করা। অর্থাৎ, পথিমধ্যে তাদের গতিরোধ করো না এবং তাদের কোনরূপ কষ্ট দিয়ো না।

অতঃপর বলা হয়েছে ঃ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا অর্থাৎ, প্রথম আয়াতে এহ্রাম অবস্থায় শিকার করতে যে নিষেধ করা হয়েছিল, এখানে সে নিষেধাজ্ঞার সীমা বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন তোমরা এহ্রাম থেকে মুক্ত হয়ে যাও, তখন শিকার করার নিষেধাজ্ঞা শেষ হয়ে যাবে। অতএব, তখন শিকারও করতে পারবে।

উল্লেখিত আয়াতে প্রত্যেক মানব ও পালনকর্তার মধ্যকার চুক্তির কয়েকটি অংশ এ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে এতে প্রথমে আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর

প্রতি সর্বাবস্থায় সম্মান প্রদর্শন করতে এবং এগুলোর অবমাননা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতঃপর বিশেষভাবে হজ্ব সম্পর্কিত আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর কিছু বিবরণ রয়েছে। তন্মধ্যে হজ্বের উদ্দেশে আগমনকারী যাত্রীসাধারণ ও তাদের সাথে আনীত কুরবানীর জন্তুদের প্রতিরোধ ও সেগুলোর অবমাননা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

অতঃপর চুক্তির দ্বিতীয় অংশ এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا

অর্থাৎ, যে সম্প্রদায় হোদায়বিয়ার ঘটনার সময় তোমাদের মক্কায় প্রবেশ করতে এবং ওমরা পালন করতে বাধা প্রদান করেছিল এবং তোমরা তীব্র ক্ষোভ ও দুঃখ নিয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এসেছিলে, এখন শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী হয়ে তোমরা তাদের কাছ থেকে এভাবে প্রতিশোধ নিও না যে, তোমরা তাদের কাবাগৃহে ও পবিত্র মসজিদে প্রবেশ করতে এবং হজ্ব করতে বাধা দিতে শুরু করবে। এটাই হবে জুলুম। আর ইসলাম জুলুমের উত্তরে জুলুম করতে চায় না। বরং ইসলাম জুলুমের প্রতিদানে ইনসাফ এবং ইনসাফে কায়েম থাকার শিক্ষা দেয়। তারা শক্তি ও ক্ষমতা হাতে পেয়ে মুসলমানদের পবিত্র মসজিদে প্রবেশ করতে এবং ওমরা পালন করতে অন্যায়ভাবে বাধা দিয়েছিল। এখন এর প্রত্যুত্তরে এরূপ হওয়া সমীচীন নয় যে, মুসলমানরা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে তাদের হজ্বের ক্রিয়াকর্ম থেকে বাধা প্রদান করবে।

কোরআন পাকের শিক্ষা এই যে, ইনসাফ ও ন্যায়বিচারে শত্রু-মিত্র সব সমান। তোমাদের শত্রু যতই কঠোর হোক সে তোমাদের যতই কষ্ট দিয়ে থাকুক, তার ব্যাপারেও ন্যায়বিচার করা তোমাদের কর্তব্য।

এটা ইসলামেরই বৈশিষ্ট্য যে, সে শত্রুদের অধিকারও সংরক্ষণ করে এবং তাদের অন্যায়ের প্রত্যুত্তরে অন্যায় দ্বারা নয়; বরং ন্যায় বিচার দ্বারা দিতে শিক্ষা দেয়।

পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার কোরআনী মূলনীতি ঃ

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

আলোচ্য অংশটুকু সূরা মায়েদার দ্বিতীয় আয়াতের শেষ বাক্য। এতে কোরআন পাক এমন একটি মৌলিক প্রশ্ন সম্পর্কে বিজ্ঞজনোচিত ফয়সালা দিয়েছে, যা সমগ্র বিশ্ব-ব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ। এর উপরই মানুষের সর্ব প্রকার মঙ্গল ও সাফল্য বরং তার অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। এ প্রশ্নটি হচ্ছে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা। জ্ঞানী মাত্রই জানে যে, এ বিশ্বের গোটা রক্ষা ব্যবস্থা মানুষের পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি একজন অন্যজনের সাহায্য না করে, তবে একাকী মানুষ হিসেবে সে যতই বুদ্ধিমান, শক্তিধর অথবা বিত্তশালী হোক, জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্র কিছুতেই সংগ্রহ করতে পারবে না। একাকী মানুষ স্বীয় খাদ্যের জন্যে শস্য উৎপাদন থেকে শুরু করে আহারোপযোগী করা পর্যন্ত সব স্তর অতিক্রম করতে পারে না। এমনিভাবে পোশাক-পরিচ্ছদের জন্যে তুলা চাষ থেকে শুরু করে স্বীয় দেহের মানানসই পোশাক তৈরী করা পর্যন্ত অসংখ্য সমস্যার সমাধান করতে একাকী কোন মানুষ কিছুতেই সক্ষম নয়। মোটকথা, প্রত্যেকটি মানুষই জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অন্য হাজারো লাখো মানুষের মুখাপেক্ষী। তাদের পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা দ্বারাই সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাপনা চালু রয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায়, এ সাহায্য ও সহযোগিতা পার্থিব জীবনের জন্যেই জরুরী নয়— মৃত্যু থেকে নিয়ে কবরে সমাহিত হওয়া পর্যন্ত সকল স্তরও এ সাহায্য ও সহযোগিতার মুখাপেক্ষী। বরং এর পরও মানুষ জীবিতদের দোয়ায়ে-মাগফেরাত ও ইছালে-ছওয়াবের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে।

আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় অসীম জ্ঞান ও পরিপূর্ণ ক্ষমতায় বিশ্বচরাচরের জন্যে এমন অটুট ব্যবস্থা রচনা করেছেন, যাতে একজন অন্যজনের মুখাপেক্ষী। দরিদ্র ব্যক্তি পয়সার জন্যে যেমন ধনীর মুখাপেক্ষী, তেমনি শ্রেষ্ঠতম ধনী ব্যক্তিও পরিশ্রম ও মেহনতের জন্যে দিনমজুরের মুখাপেক্ষী। ব্যবসায়ী গ্রাহকের মুখাপেক্ষী এবং গ্রাহক ব্যবসায়ীর মুখাপেক্ষী। গৃহ নির্মাতা রাজমিস্ত্রী, কর্মকার, ছুতারের মুখাপেক্ষী এবং এরা সবাই গৃহনির্মাতার মুখাপেক্ষী। যদি এহেন সর্বব্যাপী মুখাপেক্ষিতা না থাকতো এবং সাহায্য-সহযোগিতা কেবল নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের উপরই নির্ভরশীল হতো, তবে কে কার কাজ করতে এগিয়ে আসতো। এমতাবস্থায় সাহায্য-সহযোগিতার দশাও তাই হতো, যা এ জগতে সাধারণ নৈতিক মূল্যবোধের হচ্ছে। যদি এ কর্মবন্টন কোন সরকার অথবা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আইন আকারে করে দেওয়া হতো, তবে এর পরিণামও তাই হতো, যা আজকাল সারা বিশ্বে জাগতিক আইনের ক্ষেত্রে হচ্ছে। অর্থাৎ, আইন খাতাপত্রে সংরক্ষিত আছে এবং বাজারে ও অফিস আদালতে ঘুষ, অন্যায় সুবিধাদান, কর্তব্যবিমুখতা ও কর্মহীনতার আইন চালু রয়েছে। একমাত্র সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলার ব্যবস্থাপনাই বিভিন্ন মানুষের মনে বিভিন্ন কারবারের স্পৃহা ও যোগ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছে।

মোটকথা, সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাপনাও পারস্পরিক সম্পর্কের উপরই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এ চিত্রের একটা ভিন্ন পিঠও আছে। তা এই যে, যদি অপরাধ, চুরি, ডাকাতি, হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদির জন্যে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা হতে থাকে, চোর ও ডাকাতদের বড় বড় সুশৃঙ্খল দল গঠিত হয়ে যায়, তবে এ সাহায্য ও সহযোগিতাই বিশ্বব্যবস্থাকে তছনছও করে দিতে পারে। এতে বোঝা গেল যে, পারস্পরিক সহযোগিতা একটি দুধারী তরবারি— যা নিজের উপরও চালিত হতে পারে এবং বিশ্বব্যবস্থাকেও বানচাল করতে পারে। এ বিশ্ব মঙ্গলামঙ্গল, ভালমন্দ এবং সৎ-অসতের আবাসভূমি। এ কারণে এতে এরূপ হওয়া অসম্ভব ছিল না। এখানে অপরাধ, হত্যা, লুণ্ঠন ও কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও শক্তি ব্যবহৃত হতে পারত। এটা শুধু সম্ভাবনাই নয়; বরং বাস্তব আকারে বিশ্ববাসীর সামনে ফুটে উঠেছে। তাই এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিশ্বের জ্ঞানীগুণীরা স্বীয় হেফাযতের জন্যে বিভিন্ন মতবাদের ভিত্তিতে বিশেষ বিশেষ দল অথবা জাতির ভিত্তি স্থাপন করেছে— যাতে একদল অথবা একজাতির বিরুদ্ধে অন্য দল অথবা অন্য জাতি আক্রমনোদ্যত হলে সবাই মিলে পারস্পরিক সহযোগিতার শক্তি ব্যবহার করে তা প্রতিহত করতে পারে।

জাতীয়তা বন্টন ঃ আবদুল করিম শাহরেস্তানী প্রণীত 'মিলাল ওয়ান্‌নিহাল' গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ প্রথম দিকে যখন পৃথিবীর জনসংখ্যা বেশী ছিল না, তখন বিশ্বের চার দিকের ভিত্তিতে চারটি জাতীয়তা জন্মলাভ করে ঃ প্রাচ্য, পাশ্চাত্য, দক্ষিণ, উত্তর প্রত্যেক দিকে বসবাসকারীরা নিজেদেরকে এক জাতি এবং অন্যকে ভিন্ন জাতি মনে

করতে থাকে এবং এর ভিত্তিতেই পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তি রচিত হতে থাকে। এরপর যখন জনসংখ্যা বেড়ে যায়, তখন প্রত্যেক দিকের লোকদের মধ্যে বংশ ও গোত্রের ভিত্তিতে জাতীয়তার ধারণা বদ্ধমূল হতে থাকে। আরবের সমগ্র ব্যবস্থা এ বংশ ও গোত্রগত ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। এর ভিত্তিতেই যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হতো। বনূ হাশেম এক জাতি, বনূ তামীম অন্য জাতি এবং বনূ খোযায়াহ্ স্বতন্ত্র একটি জাতি বলে বিবেচিত হতো। হিন্দুদের মধ্যে আজ পর্যন্ত উচ্চজাত ও নীচ জাতের ব্যবধান অব্যাহত রয়েছে।

আধুনিক ইউরোপীয়রা নিজেদের বংশ তো বিসর্জন দিয়েছেই, অন্যান্যদের রক্ত-ধারাকেও তারা মূল্যহীন প্রতিপন্ন করেছে। দুনিয়ায় তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই তারা বংশগত ও গোত্রগত জাতীয়তা ও বিভাগকে নিশ্চিহ্ন করে আবার আঞ্চলিক, প্রাদেশিক, দেশ ও ভাষার ভিত্তিতে মানবজাতিকে খন্ড-বিখন্ড করে পৃথক পৃথক জাতি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আজ প্রায় সারা বিশ্বেই ভাষা এবং অঞ্চল ভিত্তিক জাতীয়তার ধারণা চালু হয়ে গেছে। এমনকি, মুসলমানরাও এ জাদুর পরশ থেকে মুক্ত নয়। আরবী, তুর্কী, ইরাকী, সিন্ধীর বিভাগই নয়; বরং তাদের মধ্যেই ভাগফলকে ভাগ করে মিসরী, সিরীয়, হেজাযী, নজ্‌দী এবং পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী, সিন্ধী, হিন্দী ইত্যাদি পৃথক পৃথক জাতি জন্মলাভ করেছে। ইউরোপীয়রা এসবের ভিত্তিতেই সরকারী কাজ-কারবার পরিচালনা করেছে। ফলে আঞ্চলিকতা ভিত্তিক বিদ্বেষ জনগণের শিরা-উপশিরায় ঢুকে পড়েছে এবং প্রত্যেক প্রদেশের জনগণ এর ভিত্তিতেই সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে।

জাতীয়তা ও কোরআনী শিক্ষা ঃ কোরআন পাক মানুষকে আবার ভুলে যাওয়া সবক স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। সূরা নেসার প্রথম আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে ঃ তোমরা সব মানুষ এক পিতা-মাতার সন্তান। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিদায় হজ্বের ভাষণে ঘোষণা করেন যে, কোন আরবের অনারবের উপর অথবা কোন শ্বেতাঙ্গের কৃষ্ণাঙ্গের উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই। খোদাভীতি ও খোদার আনুগত্যই শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি। কোরআনের এ শিক্ষা إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই) ঘোষণা করে আবিসিনিয়ার কৃষ্ণাঙ্গকে লাল তুর্কী ও রোমীর ভাই এবং অনারব নীচ জাতের মানুষকে কোরায়শী ও হাশেমী আরবের ভাই করে দিয়েছে। জাতীয়তা ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি এভাবে রচনা করেছে যে, যারা আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রসূলকে মেনে চলে, তারা এক জাতি এবং যারা মানে না, তারা ভিন্ন জাতি। জাতীয়তার এ ভিত্তিই আবু জেহেল ও আবু লাহাবের পারিবারিক সম্পর্ক রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে ছিন্ন করে দিয়েছে এবং বেলাল হাবশী ও ছুহায়েব রোমীর সম্পর্ককে তাঁর সাথে জুড়ে দিয়েছে।

হাসান বসরা থেকে, বেলাল হাবাশা থেকে এবং ছুহাইব রোম থেকে এলেন অথচ মক্কার পবিত্র মাটি থেকে উঠলো আবু জেহেল. 'এটা কেমন আশ্চর্যজনক ব্যাপার' এমনকি, কোরআন পাক ঘোষণা করেছে ঃ

خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُمْ مُّؤْمِنٌ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছ— কিছু কাফের হয়ে গেছ এবং কিছু মুমিন। বদর, ওহুদ, আহযাব ও হোনায়নের যুদ্ধে কোরআনের এ বিভক্তি কার্যক্ষেত্রে বিকাশ লাভ করেছিল। বংশগত ভাই আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্যের বাইরে চলে যাওয়ার কারণে মুসলমান ভাইয়ের ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক তার সাথে ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং সে তার তরবারির নীচে এসে গিয়েছিল। বদর ওহুদ ও খন্দকের ঘটনাবলী এ সত্যের সাক্ষ্য দেয়।

এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, যদি মুসলমান ভাইও ন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং অন্যায় ও উৎপীড়নের পথে চলে, তবে অন্যায় কার্যে তারও সাহায্য করো না। বরং অন্যায় ও অত্যাচার থেকে তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা কর। কেননা, প্রকৃতপক্ষে এটাই তাকে বিশুদ্ধ সাহায্য—যাতে অন্যায় ও অত্যাচারের পাপে তার ইহকাল ও পরকাল বিনষ্ট না হয়।

কোরআন পাকের এ শিক্ষা সৎকর্ম ও খোদাভীতিকে আসল মাপকাঠি করেছে, তার উপরই মুসলিম জাতি জাতীয়তাবাদের প্রাচীর খাড়া করেছে এবং এর ভিত্তিতেই পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার আহবান জানিয়েছে। এর বিপরীতে পাপ ও অত্যাচার উৎপীড়নকে কঠোর অপরাধ গণ্য করেছে এবং এতে সাহায্য-সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছে। এক্ষেত্রে بر ও تقوى দু'টি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। بر শব্দের অর্থ সাধারণ তফসীরকারগণের মতে সৎকর্ম এবং تقوى শব্দের অর্থ মন্দ কাজ বর্জন। اثم শব্দের অর্থ যে কোন পাপকর্ম-অধিকার সম্পর্কিত হোক অথবা এবাদত সম্পর্কিত। عدوان শব্দের অর্থ সীমা লঙ্ঘন করা। এখানে অর্থ অত্যাচার ও উৎপীড়ন করা।

সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে সাহায্য করার জন্য রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ الدال على الخير كفاعله - অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোন সৎকর্মের পথ বলে দেয়, সে ততটুকু ছওয়াব পাবে, যতটুকু নিজে সৎকর্মটি করলে পেত। -(ইবনে-কাসীর)

সহীহ্ বুখারীর হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি হেদায়েত ও সৎকর্মের প্রতি আহবান জানায়, তার আহবানে যতলোক সৎকর্ম করবে, সে তাদের সবার সমান ছওয়াব পাবে। এতে তাদের ছওয়াব হ্রাস করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অসৎকর্ম অথবা পাপের প্রতি আহবান করে, তার আহবানে যতলোক পাপকর্মে লিপ্ত হবে, তাদের সবার সমান গোনাহ তারও হবে। এতে তাদের গোনাহ হ্রাস করা হবে না।

ইবনে-কাসীর বর্ণিত তিবরানীর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন অত্যাচারীর সাথে তার সাহায্যার্থ বের হয়, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। এর ভিত্তিতেই পূর্ববর্তী মনীষীগণ অত্যাচারী বাদশাহর চাকুরী ও পদ গ্রহণ করতে কঠোরভাবে বিরত রয়েছেন। কারণ, এতে অত্যাচারে সহায়তা করা হয়। রুহুল-মাআনীতে فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে এ হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ কেয়ামতের দিন ডাক দেয়া হবে—অত্যাচারী ও তাদের সাহায্যকারীরা কোথায় আছ? অতঃপর যারা অত্যাচারীদের দোয়াত-কলমও ঠিক করে দিয়েছে, তাদেরকেও একটি লৌহ শবাধারে একত্রিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

কোরআন ও সুন্নার এ শিক্ষাই জগতে সততা, ইনসাফ, সহানুভূতি ও সচ্চরিত্রতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিটি ব্যক্তিকে কর্মীরূপে প্রস্তুত করেছে এবং অপরাধ ও উৎপীড়ন দমনের জন্যে প্রতিটি ব্যক্তিকে এমন সিপাহীরূপে গড়ে তুলেছিল, যারা খোদাভীতির কারণে প্রকাশ্যে ও গোপনে স্বীয় কর্তব্য পালনে বাধ্য থাকে। এ বিজ্ঞজনোচিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুফল সাহাবী ও তাবেয়ীগণের যুগে জগদ্বাসী প্রত্যক্ষ করেছে। আজকালও কোন দেশে যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিলে নাগরিক প্রতিরক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে প্রত্যেককেই কিছু কিছু আত্মরক্ষার কৌশল শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু অপরাধবৃত্তি নিবারণের জন্যে জনগণকে সৎকাজের প্রতি আহবান প্রচেষ্টা কোথাও পরিলক্ষিত হয় না।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ
اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا
أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ
فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي
مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣ يَسْأَلُونَكَ
مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ
مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ
وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ٤
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ
لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ٥

(৩) তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শুকরের মাংস, যেসব জন্তু আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত হয়, যা কণ্ঠরোধে মারা যায়, যা আঘাত লেগে মারা যায়, যা উচ্চ স্থান থেকে পতনের ফলে মারা যায়, যা শিং এর আঘাতে মারা যায় এবং যাকে হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করেছে, কিন্তু যাকে তোমরা যবেহ্ করেছ। যে জন্তু যজ্ঞবেদীতে যবেহ্ করা হয় এবং যা ভাগ্য নির্ধারক শর দ্বারা বন্টন করা হয়। এসব গোনাহ্র কাজ। আজ কাফেররা তোমাদের দ্বীন থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। অতএব তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকে ভয় কর। আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম। অতএব যে ব্যক্তি তীব্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে; কিন্তু কোন গোনাহ্র প্রতি প্রবণতা না থাকে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা ক্ষমাশীল। (৪) তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে, কি বস্তু তাদের জন্যে হালাল? বলে দিন ঃ তোমাদের জন্যে পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হয়েছে। যেসব শিকারী জন্তুকে তোমরা প্রশিক্ষণ দান কর শিকারের প্রতি প্রেরণের জন্যে এবং ওদেরকে ঐ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দাও, যা আল্লাহ্ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। এমন শিকারী জন্তু যে শিকারকে তোমাদের জন্যে ধরে রাখে, তা খাও এবং তার উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ কর। আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক। নিশ্চয় আল্লাহ্ সত্বর হিসাব গ্রহণকারী। (৫) আজ তোমাদের জন্যে পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হল। আহলে কিতাবদের খাদ্য তোমাদের জন্যে হালাল এবং তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য হালাল। তোমাদের জন্যে হালাল সতী-সাধ্বী মুসলমান নারী এবং তাদের সতী-সাধ্বী নারী, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তোমাদের পূর্বে, যখন তোমরা তাদেরকে মোহরানা প্রদান কর তাদেরকে স্ত্রী করার জন্যে, কামবাসনা চরিতার্থ করার জন্যে কিংবা গুপ্ত প্রেমে লিপ্ত হওয়ার জন্যে নয়। যে ব্যক্তি বিশ্বাসের বিষয় অবিশ্বাস করে, তার শ্রম বিফলে যাবে এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এটা জানা কথা যে, সামরিক কুচকাওয়াজ ও নাগরিক প্রতিরক্ষার নিয়ম অনুযায়ী এ কাজের অনুশীলনী হয় না; বরং এ কাজ শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়ার উপযুক্ত স্থান হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজকাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এ বিষয়বস্তুর সাথে পরিচিতই নয়। আজকালকার সাধারণ শিক্ষাঙ্গন গুলোতে بر ও تقوى তথা সৎকর্ম ও খোদাভীতির প্রবেশ নিষিদ্ধ এবং اثم ও عدوان তথা পাপ ও অত্যাচারের সকল পথ উন্মুক্ত। গোটা জাতিই যেখানে হালাল ও হারাম, ন্যায় ও অন্যায় ভুলে গিয়ে অপরাধপ্রবণ হয়ে যায়, সেখানে বেচারা পুলিশ কতদুর অপরাধ দমন করতে পারে? আজ সর্বত্র ও সবদেশে অপরাধ, চুরি, ডাকাতি, অশ্লীলতা, হত্যা, লুন্ঠন ইত্যাদি রোগ রোজ রোজ বেড়েই চলেছে এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তা দমন করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। বলাবাহুল্য, এর কারণ দু'টি ঃ এক, প্রচলিত সরকারগুলো কোরআনী ব্যবস্থা থেকে দূরে রয়েছে। ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা স্বীয় জীবনে بر ও تقوى সৎকর্ম ও খোদাভীতির মূলনীতি অনুসরণ করতে দ্বিধা বোধ করে – যদিও এর ফলশ্রুতিতে তাদের অসংখ্য দুঃখ ভোগ করতে হচ্ছে। আক্ষেপ, তারা যদি একবার পরীক্ষার জন্যেই এ তিক্ত ঢোক গিলে ফেলতো এবং খোদায়ী কুদরতের তামাশা দেখতো যে, কিভাবে তাদের এবং জনগণের জীবনে সুখ, শান্তি আরাম ও আনন্দের স্রোতধারা নেমে আসে!

দুই, জনগণ মনে করে নিয়েছে যে, অপরাধ প্রবণতা দমন করা একমাত্র সরকারের দায়িত্ব। শুধু তাই নয়, তারা পেশাদার অপরাধীদের অপরাধ গোপন করতেও সচেষ্ট থাকে। শুধু সত্যকে প্রতিষ্ঠিত ও অপরাধ দমন করার উদ্দেশে সত্য সাক্ষ্য দেওয়ার রীতিই দেশ থেকে উঠে গেছে। জনগণের বোঝা দরকার যে, অপরাধীর অপরাধ গোপন করা এবং সত্য সাক্ষ্যদানে বিরত থাকা অপরাধে সহায়তা করার নামান্তর। এটা কোরআনের আইনে হারাম ও কঠোর পাপ এবং আলোচ্য আয়াত وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ – এ বর্ণিত নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার শামিল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য অংশটুকু সূরা মায়েদার তৃতীয় আয়াত। এতে অনেক মূলনীতি এবং শাখাগত বিধি-বিধান ও মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম মাসআলাটি হচ্ছে হালাল ও হারাম জন্তু সম্পর্কিত। যেসব জন্তুর মাংস মানুষের জন্যে শারীরিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর; যেমন দেহে রোগসৃষ্টি হতে পারে; অথবা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর; যেমন চরিত্র ও অন্তরগত অবস্থা বিনষ্ট হতে পারে, কোরআন পাক সেগুলোকে অশুচি আখ্যা দিয়ে হারাম করেছে। পক্ষান্তরে যেসব জন্তুর মাংসে কোন শারীরিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতি নাই, সেগুলোকে পবিত্র ও হালাল ঘোষণা করেছে।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ তোমাদের জন্যে মৃত জন্তু হারাম করা হয়েছে। 'মৃত' বলে ঐ জন্তু বুঝানো হয়েছে, যা যবেহ্ ব্যতীত কোন রোগে অথবা স্বাভাবিকভাবে মরে যায়। এধরনের মৃত জন্তুর মাংস চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও মানুষের জন্যে ক্ষতিকর এবং আধ্যাতিক দিক দিয়েও।

তবে হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) দুই প্রকার মৃতকে বিধানের বাইরে রেখেছেন; একটি মৃত মাছ ও অপরটি মৃত টিড্ডী। (মুসনাদে আহমদ,